প্রকাশ : 'রাক্ষস সংস্কৃতি' পত্রিকা, সম্পাদক রাহুল ভট্টাচার্য, জানুয়ারি ১৯৯৫। লেখার সময় '৯১ থেকে '৯৪।

নিরন্তর প্রব্রজ্যায় : দ্বিতীয় খসড়া

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

।। এক।।

দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে গল্প থেকে বড় গল্প থেকে উপন্যাস : সেরকম কোনো কাহিনীই এটা নয়। কাহিনীর পরিকল্পনা। কাহিনীটা পরে লিখে ফেলার। শিগ্‌গিরি; যতটা শিগ্‌গিরি সম্ভব।

লেখাটার প্রথম খসড়ার প্রথম তারিখ তেসরা নভেম্বর, '৯১, পাতা উল্টেই দেখা যাচ্ছে। তারো বেশ কিছুদিন, প্রায় বছরখানেক আগে লেখাটা মাথায় গজিয়ে উঠবে। একটা উপন্যাস। তখনো নাম থাকবে না। বাচ্চারা আগে আসে, বাচ্চার কারণে যৌনতা, নাম পরে।

আজ নয়ই ফেব্রুয়ারি, '৯৩। এবারো এ টা পরিকল্পনা। এবং খসড়া। যদিও দ্বিতীয়।

কেন?

কতকগুলো খোঁচ, কিছু অনিশ্চয়তা? বদলে যেতে থাকা ব্রহ্মাণ্ড, মহাজাগতিক থেকে পরা-পারমানবিক, গ্রহতারা ঘোরে, পৃথিবী, নক্ষত্রমণ্ডল, ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত প্রসারমান, পরমানুর অভ্যন্তরে ঘূর্ণ্যমাণ ইলেকট্রন, প্রোটন, পরাপরমানু, নড়ছে, স্থানান্তর, স্নায়ুশরীরে ডেনড্রন বেয়ে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম আয়ন, মস্তিষ্ক, তার অভ্যন্তরে সমস্ত অনু নিয়তই ঘূর্ণ্যগতিতে, অনুকম্পন, তার ভিতর পরমানু, পরমানুগর্ভের গতি: বিশাল মহাসমুদ্রে কোনোক্রমে ভরাসাম্য বজায় রাখে মালবাহী জাহাজ, ভিতরে কোনো এক কোণে, রান্নাঘরের গুদামে আলু। মহাসমুদ্রের, মহাবিশ্বের প্রতিটি গতিরই ছায়াপাত বহন করেনা ওই আলুর ভিতরে কুরে কুরে খেয়ে চলা পোকা? পোকার অস্তিত্ব কি বহন করেনা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি সচলতাকে? পোকা কি বোঝে? পোকা কী বোঝে?

পরিকল্পনা লিখে রাখা হচ্ছে, কাহিনী নয়, মাথার ভিতরে, খসড়া থেকে খসড়ায়, বদলে যাচ্ছে পরিকল্পনাটা। পরিকল্পনা মানে কাহিনী নয়, অর্থাৎ কাহিনীর কিছুটা বদলে যাওয়ার স্বাধীনতা। পরিকল্পনাও বদলাচ্ছে, নিরন্তর। খসড়া থেকে খসড়ায়।

নামের প্রথম অংশটা: 'নিরন্তর প্রব্রজ্যায়' দেখে কি এটাকে কাহিনী বলে মনে হয়? নামের উৎস একটি বাক্য, এই লেখাতেই আসবে, সেরকমই ভেবেছি, পরবর্তী কোনো এক পরিচ্ছেদে '... মানুষ কি তার অভ্যন্তরে একটা প্রব্রজ্যাকে নিরন্তরই বহন করে চলে ... ?' — বাক্যটা প্রথম খসড়ায় ছিল, হয়ত দ্বিতীয়টাতেও থাকবে, লেখার পরই নামটা লাফিয়ে উঠল বাক্যের গা বেয়ে।

নিশ্চিত মাটিতে নিশ্চিত বীজে গাছ, নিশ্চিত নারীপুরুষের নিশ্চিত সঙ্গমে উর্বরতা এসেছিল এতাবৎকাল, কাহিনী যে লিখবে, ত্রিদিব কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারে না: কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র কে হবে, নইলে শালা লেখা যায়?

গোপালবাবু না মিহির না ত্রিদিব? নাকি দিবাকর সেন?

ত্রিদিব কাহিনীর লেখক। সততই কাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুপ্রবেশের।

কাহিনী গড়ে উঠছে মিহিরের বাড়ির পরিপ্রেক্ষিতে। মিহিরের চিন্তা, কদাচিৎ কখনো তার বৌয়েরও, সম্মুখবর্তী বাস্তবতা, পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত: এইসব। কাহিনীতে বিবৃত বাস্তবতার একমাত্র প্রত্যক্ষ চরিত্র মিহির (মানে তার বৌও)।

কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘূর্ণীর উৎসস্থল গোপালবাবুর ডায়রি।

(কেন্দ্রীয়?)

গোপালবাবুর ডায়রি, তার ঘর, তার ডায়রি লেখা, সবই কাহিনীর শরীর হয়ে ওঠার; গোপালবাবু বাদে। গোপালবাবু হাজির থাকছেন অন্যের স্মৃতিতে, আলোচনায়, উল্লেখে, আর ডায়রির অক্ষরে, রচয়িতা হিশাবে।

গোপালবাবুর ডায়রিতেই কি আসবে দিবাকর সেনের উপাখ্যান? (প্রথম খসড়ায় উপাখ্যানটির থাকা স্থির নিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয় খসড়া শুরু করার মুহূর্তে এই এখন সেটা একটা সম্ভাবনা।) দিবাকর সেন বৈজ্ঞানিক। গোপালবাবুর কল্পনার পুরুষ। গোপালবাবুর মস্তিষ্কপ্রসূত: আখ্যান, ফিকশন। আদত কাহিনীতে কেন, তার পরিকল্পনাতেও কি শেষ অব্দি থাকবেন? ত্রিদিব নিশ্চিত নয়। ধরেই নেওয়া যায় সেন-বংশের এই পুরুষ কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাত নন।

কাহিনীর আধারে এই চরিত্রগুলোর অবয়ব ঠিক কেমন দাঁড়ায় সেই সংক্রান্ত একটা পূর্বানুমান চালাই, আসুন, এদের নাম সংক্রান্ত একটা আলোচনায়।

ত্রিদিব নামটার ত্রিদিব হয়ে ওঠায় কাহিনীর বা তার পরিকল্পনার কোনো এক্তিয়ার, দাখিল নেই। ওটা বাদ দিচ্ছি। দিবাকর সেনও তাই। কাহিনীর, কাহিনী-লেখকের আওতার বাইরে গোপালবাবু নামটা পয়দা করছেন, গোপালবাবুর নিজস্ব যুক্তিমালায়। ব্যাখ্যা, যদি করতেই হয়, গোপালবাবুর দায়িত্ব।

বর্ণপরিচয়: বিদ্যাসাগর: অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর গাঙ্গেয় বদ্বীপের ছায়াপাত গোপাল নামটায়। 'গোপাল বড় সুবোধ বালক'। এটা সর্বপরিজ্ঞাত। একটা সামাজিক জ্ঞান, তথ্য। গোপালবাবুর সেই নিবিড় সামাজিক পরিচিতিটা ত্রিদিব ব্যবহার করছে। চরিত্রগুলোর এই কাহিনী-নিরপেক্ষ সামাজিক পরিচিতিটা বহু অকথিত কথাও বলে দেয়, উপরি। কৃষ্ণ নামে ডাকলেন, সততই সকলে বুঝে নিল, আর উল্লেখ না করলেও চলে: 'ভরি সভামে দ্রৌপদী খাড়ি, লাজ রাখইয়া' বা 'বৃন্দাবনমে ধেনু চরইয়া' 'এক তুম হি তো হো'। চেশায়ার বেড়াল অ্যালিস আখ্যানে তার 'প্রেজেন্ট স্যার' দিয়ে গেল, ফেলে রেখে গেছে তার হাসিখানি।

ডাইরিতে, গোপালবাবুকৃত দিবাকর সেন উপাখ্যানে, এখনো যা পরিকল্পনা ত্রিদিবের, আদ্যোপান্ত তুমুল উদ্ভটতা, একসেনট্রিসিটি। অচিন্তনীয় সেই চিন্তার উদ্ভটত্ব থাকতে পারে এলার অতীনের, বিভার অভীকের, কিম্বা লাবণ্যর অমিত-র। গোপালবাবু, গোপাল নামটা, সেখানে নিতান্তই ন্যাদোশ, নামে যা প্রকাশ।

ত্রিদিব কি এই ন্যাদোশপনার বেমানানত্বটাকেই ব্যবহার করতে চায়, তার কাহিনীতে? উৎকেন্দ্রিকতা? কেন? তার অস্তিত্বতত্ত্ব তাকে এই উৎকেন্দ্রিকতায় উৎসাহিত করে?

মিহির নামটায় একধরনের অভ্যস্ততা। সামাজিক নয় শুধু, ত্রিদিবের ব্যক্তিগত অভ্যস্ততা। মিহির নামটা প্রচুর, চারপাশে, প্রত্যেকদিন, সর্বত্র, বাংলাভাষী অঞ্চলে। ত্রিদিবের লেখায় পাঁচটা গল্পের তিনটেতেই কোনো না কোনো চরিত্রের নাম মিহির। কোনো পাঠকই, ত্রিদিবের লেখারও যে দু-চারজন আছে, কোনো আপত্তি করেনি। মিহির নামটা যে কোনো পরিস্থিতিতেই, লেখক থেকে নেতা, কুকুরসঙ্গী নারীর স্বামী থেকে তপন বিশ্বাসের বন্ধু, সব চরিত্রেই সমান স্বাভাবিক।

নাম গেল, এবার মিহিরের বাড়িটাকে, যা কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিত হয়েছিল, আমরা বুঝে নিতে চাই। বাড়ি কি শুধু কয়েকটা দেওয়াল খুঁটি ইট আর বরগা, বা, হিন্দি সিনেমার বাড়ির ক্ষেত্রে টবের গাছ, উড়ন্ত পর্দা, মেয়েদের রাতজামা বা ফোয়ারা? বাড়ি মানে তার বসবাসকারীরাও। এই বাড়ির দিনরাত্রি, রন্ধন-উপবাসে বসবাস করবে কারা? তারা কী ভাবে, কী করে, কী খায়, বিপন্নতার মুহূর্তে কোন বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়? এখনো শুধু মিহিরই থাকে সামনে, তাদের প্রতিনিধি। একটা বৌ, বাচ্চা? মিহিরদের স্বভাবত বৌ থাকে, বাচ্চা, কুঁচকিতে দাদ, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, রাজনৈতিক সমর্থনের পার্টি।

মিহিরকে চিনি, আসুন। মিহির এসবিএসটিসি-তে কাজ করে। কেন? কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। অন্য কিছুও কি হতেই পারত না? পরিকল্পনাটা যখন গজাচ্ছে, ত্রিদিবের মাথায়, পরপর কয়েকদিন এসবিএসটিসি-র বাসে চড়বে, লাল রঙের এম বাস, ডিসিএম টয়োটা, দ্রুতগামী, গিয়ার-লিভারটা দৈর্ঘ্যে খুব ছোট, পিছনদিকে ভয়ানক ঝাঁকুনি, প্রথম গর্ভবতী নারীর স্বামীরা সাবধান, কোনো এক কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টরের মুখ কি ত্রিদিবের মাথায় গেঁথে গেল, সে মুখ খুঁজছে, কোন মুখ খুঁজছে সে, কার? মিহিরের?

কার মুখ তুমি খুঁজে ফেরো, নিয়ত বাতাসে আকাশে নক্ষত্রে কার, কার সে মুখ, কার?

মিহিরের বাড়ির একটা ছবি ভাসে, ভাসছে, ত্রিদিবের চোখের সামনে, লেখার সাদা কাগজে কালো অক্ষরের সারিবদ্ধতার উপর, সুপারইম্পোজড। ধোঁয়ায় তৈরি ছবি একটা, বদলে বদলে যায়। বদলে যেতে থাকে। হলফ করে

কি বলা যায় ছবিটা ঠিক এইরকম, অন্যরকম কিছুতেই নয়? ছবি, নাকি কিছু খুঁটিনাটি? এই একটা বিন্দু, যেরকম চিনি, রোজ দেখেছি, কতবার, সেই রাস্তায়, হেঁটেছিলাম কেয়ার সাথে, জীবনানন্দ সন্ধ্যায়, ওই আর একটা বিন্দু। বিন্দুরা নড়ে, একটা বিন্দু অন্যরকম হয়ে ওঠে। যত বারান্দা দেখেছি, রাজাবাজারে রোমে কি অচেনা বাড়ির অ্যালবামে, সব বারান্দার মত একটা বারান্দা, একটা মাকড়সা, ঝুল, মৃত মানুষের ছবি, একটা ফুল, মাটিতে খসা পাঁপড়ি, উড়ে উড়ে ফুলের বৃন্তে ... ছবিটা ঠিক কী রকম? ত্রিদিব বলতে পারে না, ছবিটার একটা ছক জেগে থাকে মাত্র। একটা ছক, কিছু বিশেষতা, অস্পষ্টতার কিছু বিন্যাস।

কেন ত্রিদিব নিজেই জানেনা, মিহিরের পরিপ্রেক্ষিতে খুব আবেগ, হেভি ইমোশন দিতে ইচ্ছে করে তার। ('এইখানে একটু অ্যাকশন...', সামনের সিটের দর্শককে ত্রিদিব বলতে শুনেছিল, তিনদিনে পঞ্চমবার 'অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুসসা কিঁউ আতা হ্যায়' দেখাকালীন, ডোমিনিকের বন্ধুরা অ্যালবার্ট পিন্টো নাসিরুদ্দিনকে অপমান করছে।) কাহিনীর ভিতর মিহিরের পরিপার্শ্বে ত্রিদিব খুব হৃদয় রাখতে চায়। জ্যান্ত হৃদয়। স্পন্দনশীল। মিহির, মিহিরের বৌ, বাচ্চা বা বাচ্চারা। সেখানে পারস্পরিক অনুভূতি। নির্বাক, নিঃশব্দ, প্রাত্যহিক, অমোঘ, শিশিরের শব্দের মত। জমিয়ে লিখবে ত্রিদিব এই জায়গাটা। দু-একদিন ফেলে রাখবে। লেখার মধ্যে। সিংহ শিকার ফেলে রাখে, দু-চারবার থাবড়ায়, প্রাণ আছে না নেই, ইচ্ছে মোতাবেক একটু কামড়ায়, জিরোয়, কামড়ায়। মেজাজে লিখবে। ঝরঝর করে। কবিতার মত। লিখতে লিখতে তার পাঁজরে ছটফট, কামড়, যন্ত্রণা, আজ দশই ফেব্রুয়ারি, এখনো শীত আছে, দিন পনেরো আগে শিয়ালদায় রাত সাড়ে দশটায় ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া হাফপ্যান্টে একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা উবু হয়ে বসে তার মাকে তার গুলির সংগ্রহ দেখায়, উদ্ভাসিত চোখ, সবুজ লাল হলুদ কাঁচের গুলিতে আলোর ঝকঝক, বাচ্চাটার চোখ নড়েছিল, মার শরীরের কাছে যাবে, আরামের, আরামের, আরো কত আরামের কাছে যাবি বাচ্চা, রাস্তা খুঁটে শুকনো গু খা।

কাহিনী। কাহিনীতে আমরা পাই সাধারন মিহির এবং ততোধিক সাধারন তার বৌকে। তারা চালু সিনেমা দেখে আমোদ পায়। বচ্চনের 'অগ্নিপথ' দেখতে যাওয়ার পথে মিহির তার বৌকে বলবে, 'তুমি বুঝতে পারলে হয় — খুব পলিটিকাল বই'। তার বৌ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বলে, 'তুমি বলে দিও পরে'। সিনেমা হলের বিপরীতে রাস্তার দোকানের ঝাল আলুর চপে কামড় দেয়, ভাবে: না বুঝলেই বা কী, সিনেমা তো দেখতে আসা, যাওয়া, দেখা, চপ খাওয়া, হলের অন্ধকারে মিহিরের হাত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া: মজা। মজা তো হচ্ছেই। নয় একটু নাই বুঝল।

বৈপরীত্যে গোপালবাবুর রহস্যময়তাকে আনার কারণেই মিহিরের সরল আবেগপ্রবণতার বাস্তবতাকে আরো জলের, মাটির, রামায়ণের করে তুলতে চায় ত্রিদিব। হাত দিয়ে, হাতের তালু আঙুল, ছোঁবে পুরোটাকে। মাটি। মাটির মত। মাটি থেকে প্রহেলিকা জন্মায়, আলো অন্ধকারের সন্ধিকাল, বাতাস ছেয়ে ফেলছে, আকাশ গাছ জল মানুষের হাড়, মাটি ফুঁড়ে প্রহেলিকা উঠেছিল, শান্ত নরম ভিজে মাটি, পা দেবে যায়, পাতা পচা আর বোঁদের গন্ধ, জলামাটির নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি, জলামাটি, জল মাটি জল মাটি জল। জলাভূমির পচাপাতা থেকে আলেয়া। কোনটা আলেয়া, প্রেত, নিশির ডাক তুমি চেনো? কোনটা শুধু এক আহ্বানে তোমার বুকের খাঁচা থেকে জ্যান্ত ফুসফুস উপড়ে নিতে পারে? চেনো তুমি? তুমি শান্তিতে থাকো, আরামে। জলাভূমিতে, কাটামাটিতে প্রেত বাড়ছে, শরীর অশরীর।

টর্চ নিয়ে জলজঙ্গলে এই রাতে তুমি বেরোলে, প্রেত খুঁজতে, কী করে তাদের খুঁজে পাবে তুমি? তোমার টর্চের আলোয়? (আমার বৌ-এর এক হোস্টেলবন্ধুর স্বামী, হোস্টেলের যুবতীনিবিড় রাতে আমার বৌয়ের বন্ধু গল্প করেছিল, পরে বৌ আমাকে গল্প করবে, নববিবাহিত স্বামী রাতের বেলা টর্চ জ্বালিয়ে স্ত্রীশরীর দেখে, জীবনে প্রথম বার, নৈকট্যে, ইহা স্তন হয়, যোনি হয়, স্ত্রীকেশ, শরীর দেখেছিল, অশরীর?) তার চেয়ে অন্ধকারে এসো। যার ছায়া পড়ে না তাকে আলো জ্বালিয়ে খোঁজা যায় না। সব ছায়া, অন্ধকার, হাতড়াও, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, পাবে।

মিহিরের জলমাটিরামায়ণের পরিপ্রেক্ষিতের ভিতরই, ধীরে, আলতো পায়ে গোপালবাবুর প্রসঙ্গ। লেখার ভঙ্গি শান্ত, অনুত্তেজিত। কোনো চমক নয়। আমাদের গভীরতম উন্মোচনগুলোয় কোনো চমক থাকে না। মিহিরের অস্তিত্বের ভিতর, জীবনের ভিতর এতদিন টিকে আছে গোপালবাবু, এখনো, কোনোরকম কোনো চমক ব্যতিরেকে।

মিহির ছোট ছিল, থ্রি ফুট থ্রি, বার্ডজ অ্যান্ড বিজ খুঁজতে আরম্ভ করেনি, মিহরের সেই বালকবয়স থেকেই গোপালবাবু থাকবে মিহিরের বাড়িতে। ত্রিদিব সেরকমই ভেবেছে। পেয়িং গেস্ট? মিহিরদের সামাজিক কোটিতে, মিহরের বাবার মাল্টিপারপাজ মানে মুদি কাম স্টেশনারি দোকান, সেই মানুষদের শব্দভাণ্ডারে 'পেয়িং গেস্ট' শব্দটা নেই, থাকে না।

গোপালবাবু ভাড়াটে। ভাড়াটে, যাকে খাবার দিতে হয়। দুবেলা ভাত, সকালে চা বিস্কুট। তার বদলে পয়সা দেয় গোপালবাবু। গোপালবাবু ব্যাংকচাকুরে। পাড়ায় একজন, একই ব্যাংকের, জুটিয়ে দিয়েছিল। গোপালবাবু লক্ষ্মী ভাড়াটে। চিরকালই। মাসের এক তারিখেই বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে এসেছে এতকাল। মানুষ বদলেছে, বাড়িওয়ালা, হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই থেকে চিন-ভারত যুদ্ধ থেকে চিনের চেয়ারম্যান ..., ব্যাংক-জাতীয়করণ থেকে ইন্ডিয়ান রেলের প্রাইভেটাইজেশনের স্লোগান, মিহিরের বাবা একসময় মরে গেল, যেমন যায়, নিয়ম বদলায়নি। এই মাসটা, এই শেষ মাসটা, চালু মাসে সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে: সেটাই কাহিনী।

মিহিরদের লম্বা বারান্দার একটা পাশ দিয়ে ঘর বানানো হবে, নইলে গোপালবাবু থাকবে কোথায়, টাকা গোপালবাবু দেয়, ভাড়া থেকে মাস মাস কাটা যেত, মিটে গেছে অনেকদিন হল।

একটা ধন্দ: লিখে নেওয়া যাক।

মিহিরদের বাড়িটা সিমেন্টের মেঝে টিনের চাল বেড়ার দেওয়াল না আপাদমস্তক পাকা?

কিসের উপর নির্ভরশীল এই বিষয়টা — কী চিহ্নিত হয় এটার দ্বারা — মিহির টাকা ঝাড়ে কিনা? শোনায় যায় অন্য অনেক সরকারি চাকরির মত এসবিএসটিসি-র কন্ডাক্টরি রত্নগর্ভা। তিন বছরে বাড়ি ওঠে। (পাবিলিক বনাম প্রাইভেট সেক্টর: মনমোহন সিং।) মিহির কি কন্ডাক্টর? তাহলে মাঝে মাঝে দোকানে কাটানোর সময় সে পাবে কী করে? কী করেই বা অনুপস্থিত গোপালবাবুর বই-আকীর্ণ ঘরে কাটাতে শুরু করবে, প্রায়ই, পরে, যখন গোপালবাবুর ডায়রির অভিঘাতে মিহিরের জীবন-সংস্থান ঘুলিয়ে গিয়েছিল?

ঘুলিয়ে যাওয়া না স্থিতি পাওয়া? অন্তহীন প্রব্রজ্যার পর, শুশুক হাঙর প্ল্যাংক্টন আনন্ত তরঙ্গরাশির পর লাবণ্যম্বুরাশের্ধারা-নিবদ্ধেব-কলঙ্করেখা?

গোপালবাবু লক্ষ্মী ভাড়াটে। লক্ষ্মী তার মাসপয়লার টাকা। দোকানের অসময়ের দিনগুলো, মিহিরের বাবা, সন্ধ্যা থেকে রাত ক্রমে গভীর, দোকানের ক্যাশবাক্সে বাঁ-কনুই-এর ভর, ঝুঁকে আছে সামনে, আসবে, খদ্দের আসবে, কোনো খদ্দের, মা গেছে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে সে প্রশ্ন মনে না-রেখে, মিহির-মমতা বইয়ের সামনে বসেই থাকে, ঘুমোয় নি, খালিপেটে ঘুম আসেনা, গোপালবাবুর টাকাই তখন মিহিরদের তরিয়ে দিত। তারই টাকায় রোজ সকালে হকার আসে, একবার কি দুবার মাত্র ক্রিং-শব্দেও কি ব্যস্ততা টের পাওয়া গেল, কচার বেড়ার উপর দিয়ে বারান্দায় ছোঁড়ে পাকানো কাগজ। ঘুম থেকে সদ্য টেনে তুলে দেওয়া মিহির চোখ কচলাতে কচলাতে, প্যান্টেরা শুধু কোমর থেকে নেমে যেতে চায় কেন, বাঁ বগলে ছাপার গন্ধে ভুরভুর পাট-না-ভাঙা খবরের কাগজ, ডান হাতে প্লেটে চায়ের কাপ, আর প্লেটের উপর রাখলে চা চলকে ভিজে ওঠা এড়াতে কাগজে মোড়া দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট বাঁ হাতের আঙুলে, গোপালবাবুর দরজায় গিয়ে করাঘাত করে। দরজাটা সামান্য ফাঁক, যতটুকু না হলে নয়, হাত বাড়িয়ে চা নিত গোপালবাবু।

সারা ছেলেবেলা গোপালবাবুর দরজা ওই একটুখানি ফাঁকের চেয়ে বেশি কিছু কখনো দেখেছে মিহির?

গোপালবাবুর সকালের আর রাতের খাবার দিতে যেত মিহিরের মা, পরে, আজকাল, মিহিরের বৌ।

সন্ধের পর ঘরের ভিতর বসে পড়াশোনা এবং তৎসহ ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি যা যা ঘটে থাকে, মিহির আর ওর বোন মমতা শুনতে পেত, গোপালবাবু দাওয়ায় উঠছে, উঠল, ওই উঠে পড়ল, ওই, ওই ঘরের দরজা খুলল। প্রথম শব্দটা পেয়েই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাত এবং ভ্রূ নাচিয়ে বা না-নাচিয়ে একটা ভঙ্গি করত, কখনো বা মিহিরের হাঁটুর উপর মমতার আঙুলের একটা চিমটি, চমকাল, তবু শব্দ করেনি মিহির। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার, সুইচ টেপার, উল্টো দিকের দেওয়ালে জানলা খুলে দেওয়ার শব্দ: এই পর্যন্ত ওরা স্পষ্ট চিনতে পারবে। এর পর থেকে সমস্ত শব্দই ছোটখাট। এলোপাথাড়ি। অস্পষ্ট। একটা শব্দ ছাড়া। এর পর পরই। শব্দটার জন্য প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ মমতামিহির, মিহির কোনো শব্দ করেনি, তাও মমতা হাতে উডপেন্সিল কি আর্টেক্স প্লাস্টিকবডি থাকা অবস্থায় আঙুল সোজা করে হাত উপরে তুলবে: নিঃশব্দ থাকার অনুজ্ঞা। শ্বাস ফেলার শব্দ গুনছে দুজনে, সেই শব্দটা কানে আসত মমতামিহিরের। জুতোজোড়া দরজার পাশে (নিশ্চয়ই) খুলে রেখে গোপালবাবু একজোড়া হাওয়াই চটি পরে নেয়। হাওয়াই চটি পরার আগে, হয়ত অভ্যাসবশতঃ, হয়ত ধুলোঝাড়া, বেশ জোরে ফটাশ শব্দে মাটিতে ফেলত কাঠের

সরু চটা দিয়ে তৈরি ছোট র‍্যাকের নিচের তাক থেকে তুলে। কাহিনীর অভ্যন্তরে, অনেক পরে, তখন আর মিহির ছোট নেই, এই র‍্যাকের উপরের তাকে গোপালবাবুর ওষুধবিষুদের শিশিবোতল দেখতে পাবে মিহির: গোপালবাবুর শরীর সংক্রান্ত একটা দুশ্চিন্তা : এরকমই পরিকল্পনা। (অবশ্য একই র‍্যাক সেটা না হতেই পারে, মধ্যে অতগুলো অতিক্রান্ত বছরের ব্যবধান। একটা জীবন মানে কত কত অগুন্তি র‍্যাক, র‍্যাক থেকে র‍্যাক, র‍্যাক বদলে যেতে থাকে, মানুষ কত র‍্যাক কেনে, ব্যবহার করে একটা গোটা জীবনে।)

হাওয়াই পায়ে, পরনে চেক লুঙ্গি, খালি গা, কাঁধের গামছা নিয়ে গিয়ে পায়খানার সামনে তারের খুঁটিতে রাখবে, গোপালবাবু কলজল সারতে যেত। পায়খানায় বসে সিগারেট খায় গোপালবাবু: পায়খানার দেওয়ালে হাওয়া চলাচলের খোঁদলে ফাঁকা দেশলাই জমে একের পর এক, ঘোড়ার মাথাই বেশি। ক্যাপস্টান প্লেন সিগারেট, নীল সাদা প্যাকেট, বাড়ির বারান্দায়, উঠোনে প্রায়ই খুঁজে পেত মিহির, তার চারা-খেলার ক্যাশ সমৃদ্ধতর আরো দুটি সাদা-নীল তাসের সংগ্রহে।

গোপালবাবু ফিরে আসত : ক্যালেন্ডার, যৌবন, পায়খানা এবং প্রেম সবই একসময় শেষ হয়ে যায়।

পড়তে বসে থাকা, অসহায়, দুটি বালকবালিকা কান খাড়া করে খেয়াল রাখত : শব্দের মানচিত্র। দুচারবার তক্তাপোষের ক্যাঁচ শব্দ। তখন, গলা সচেতন-ফিশফিশে, মা শুনে ফেললেই রান্নাঘরে বসে চেঁচাবে, বাবা মা-র থেকে সামান্যই দুরে : দোকানে, সন্তর্পণে বলত মমতা, 'ওই — এসেই শুয়ে পড়ল, হি হি।' মিহিরও হাসে। শুয়ে পড়ার ভিতর হাস্য-উদ্রেককারী উপাদানটা ঠিক কী ছিল?

এত কাছে, এত দিন যাবৎ, একই বাড়িতে বসবাস, গোপালবাবু মিহিরের কাছে চিরকালই একটা অপরিচয়, রহস্যময়তা। মিহিরের সমান্তরালে রহস্যটাও বয়োবৃদ্ধ হয়। রহস্য, যেমন হয়, জীবনের অন্যান্য উপাদানের মত একই রকম স্বাভাবিক ও সাধারণ মিহিরের সমগ্রে : কাহিনীটা সেভাবেই লেখার পরিকল্পনা ত্রিদিবের।

রহস্য ঠিক কী রকম হয় ত্রিদিব? রহস্য কাকে বলে? তুমি এখন যেখানে বসে লিখছ, যে বাড়িতে, সল্টলেকে, চকচকে মেঝে ও মানুষ, একজন প্রান্তিক মানুষ সেখানে থাকে, মার্জিনাল ম্যান, না উওম্যান, কাজের লোক। মাঝে মাঝে তার পিছনে এসে কেউ দাঁড়ায়, তার চুল টানে, মাথায় বাড়ি মারে, 'মাথার ভিতরটা খুবলে দেয়, জানো দাদা, খারাপ খারাপ কথা বলে', সেই আগন্তুকের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত থাকে কাজের লোকটি। নারী, শুধু নারী হওয়ার কারণেই (মাত্র ক্লাস এইটে চারতলার বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে কাঁচের শোকেসে কঙ্কাল দেখাবেন মাস্টারমশাই, 'এটা স্যার মেয়ের কঙ্কাল, না ছেলের?' দীপকবাবুর মুখ লাল হয়েছিল। অ্যান্ড নাও আই অ্যাম নাইন্টিথ্রি, অ্যান্ড কেয়ার এ ড্যাম ইউ সি, এখনো জানিনি : নারী ও পুরুষের পার্থক্য কতটা, আমারো তো স্তন আছে, লিঙ্গকে ক্লিটোরিস বলে ডাকলাম, অতিবৃদ্ধ ক্লিটোরিস, আমি কতখানি পুরুষ : কঙ্কালে কঙ্কালে?) তার অভিজ্ঞতায় কিছু অতিরিক্ত উপাদান, যা শুধু নারীরই থাকে, ধর্ষণ বা ধর্ষণোপমতা, মুহূর্তিক বা নিরবচ্ছিন্ন। সেই কাজের লোকটি ত্রিদিবকে দেখায়, ফাঁকা সিঙ্কে খোলা ট্যাপ থেকে ধাবমান জলে আগন্তুকের উপস্থিতি, 'ওই, উদিকে', জানলার কাঁচের বাইরে অন্ধকারে আগন্তুক কেমন অপেক্ষা করে, রান্নাঘর থেকে অন্যরা চলে যাওয়ার। ত্রিদিবও কি আজকাল দেখতে পাচ্ছে আগন্তুককে? (এখানে বেশি নয়, এগুলো পরবর্তী উপন্যাসের উপাদান।)

ত্রিদিবের এই কাহিনীতে রহস্যও আছে, সঙ্গে চা দিয়ে আসার প্রাত্যহিকতা। মিহির বড় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বদলায় রহস্যের চরিত্র। (রহস্যের না রহস্যের প্রতি সচেতনতার?) ছোটবেলার মজা, ছেলেমানুষি ক্রমে জৈবিক, জৈবনিক। শেষ কৈশোর, প্রথম যৌবন, সেই সময়টায় বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত সমাধানই নারী-নিমৃত বলে মনে হয় ক্রমে পুরুষ হয়ে উঠতে থাকা তরুণদের, মিহিরের মনে হত, গোপালবাবুর নিশ্চয়ই প্রেম ছিল একটা, কোথাও না কোথাও, প্রেমিকা ল্যাঙ দিয়েছে, আর বিয়ে করেনি। মান্নার ঝাড়-খাওয়া সিরিজের গানে যেমন থাকে, 'নিরালায় বসে বেঁধেছি তোমার স্মরণবীণ'। বা হয়ত বিয়ে করেছিল। বৌ পালিয়ে গেছে। কারুর কারুর বৌ তো পালিয়ে যায়ই। তারপরই এরকম, শুধু একা হতেছে একাকী। আত্মীয় স্বজন, পুরোনো পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে পলাতক। চাকরি, খাওয়া, ঘুম, শুধু নিজের সঙ্গে। একরকম বিবাগী হয়ে যাওয়া। ইত্যাদি কতকিছু ভেবেছে মিহির। সেই ভাবনাও বদলাচ্ছিল; তার বয়স বাড়ছে।

পরিকল্পনায় এযাবৎ নথীকৃত বিষয়গুলো কখনোই সরাসরি কাহিনীতে আসার নয়। কাহিনীতে শুধু বর্তমান, এই বর্তমান। মিহির, কখনো মিহিরের বৌ, তাদের ভাবনা-প্রবাহ, স্মৃতি, শ্রুতি, ব্যাকরণ, আবর্তন, প্রত্যাবর্তন, টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ। দু-একটা লেখকের মন্তব্য। এই ভাবে অতীত। অতীত অনুপ্রবেশ করছে। বর্তমানের শরীরে ঢুকে পড়ছে অতীত। ঢুকে পড়বে কাহিনীতে। এই ভান বজায় রেখে যে অনুপ্রবেশটা স্বতঃস্ফূর্ত, এসে পড়ল এমনিতেই : কোনো বিশেষ পরিকল্পনার অংশ নয়।

কাহিনীর জন্য কেন এই বিষয়টাকে বাছল ত্রিদিব? একটা অপরিচয়ের রহস্যকে ত্রিদিব ধরতে চাইছে? রহস্য যা জন্মেছে, বেড়ে উঠবে প্রাত্যহিকতার গভীরে? প্রাত্যহিকতার অন্তর্গত রহস্যকে সামনে দাঁড়াতে, লিখে উঠতে চাইছে? লেখা, লেখা মানে উপস্থিতি, অর্জন করতে চাইছে? অজস্র রহস্যকে নিজস্ব প্রাত্যহিকতায়? ('ভ্রমণ উপকথা', প্রথম খসড়া করা আছে, ফের লিখবে শিগ্গিরি, উপন্যাসটার বিষয়ই তাই, বোরহেস থেকে ঝেড়েছে, যে যা লিখছে, তাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে রাজস্থানে, পুজোয় বেড়াতে গিয়ে টের পেল ত্রিদিব আর কেয়া।) লেখায় রহস্যকে অর্জন করা : যেন তার প্রাত্যহিক এতে সহস্র অজস্র রহস্যের গর্ভধারণের সক্ষমতা অর্জন করবে। সে চাইছে, এটাকেই বিষয় করতে চাইছে, পরিকল্পনার প্রথম খসড়া শুরু করার প্রায় বছরখানেক আগে, সেই '৯০ সাল থেকে, 'তপন বিশ্বাসের খিদের বত্রিশ ঘন্টা', প্রথম খসড়ায় নাম ছিল 'তপন বিশ্বাস', লিখে চলার সময় থেকেই চাইছে।

প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রতিটা দিন, প্রতি সপ্তাহ, মাস, বছরের প্রাত্যহিকতা : তার অভ্যন্তরেই একটা স্বপ্ন, সম্ভাবনা, কল্পনা, যাদু, রহস্যের বীজ : খুব ভিতর থেকেই পুরোটা বদলে যাওয়ার একটা মন্ত্রোচ্চারণ সে খুঁজে পেতে চেয়েছে। সেই ইচ্ছে তাকে কাহিনীর এই বিষয়ের দিকে ধাওয়া করে আনল। 'রগ্‌দিয়ে আনল', যেমন বলে সেই এলাকায়, যেখানে একটা কলেজে সে এখন মাস্টারি করে, পাহাড়ের পাদদেশে ছবির মত কলেজ, ছবির মত শূন্যতা, দুই ইয়ার মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা আট, শিক্ষাজগত বিস্তৃত হচ্ছে, সভ্যতা, দূরান্ত পর্যন্ত, টিচার্স রুমে বসে নিজের শ্বাসের শব্দ ক্লান্তিকর রকমের উচ্চকিত মনে হয়; নৈঃশব্দ্য।

বাস্তবতার শরীরে একটা যাদু খোঁজে ত্রিদিব। একটা মোচড়। যাকে চিহ্নে রূপান্তরিত করবে, হিয়েরোগ্লিফে পর্যবসিত করবে, কাহিনীটাকে একটা মন্ত্র করে তোলা, একটা উচ্চারণ, তার ভিতর সব দিন ও রাত্রি, বরফ ও অন্ধকার, বেদনা ও প্রতিরোধ। সবকিছু : যত কথা বলা যায়নি, যত কথা বলা যায়না, বলা হয়ে ওঠেনা, বলা দরকার, কাকে কী ভাবে হত্যা করতে হবে, কতটা রক্তপাত, শরীরের কোন স্নায়ুকেন্দ্রে কতটা হিংস্রতা, কোন অঙ্গে কতটা উল্লাস : সবকিছুর একটা সূত্র, সমীকরণ, মন্ত্র।

কাহিনী, কাহিনীর যে বীজ মাথায় প্রথম পয়দা হল সেটা গোপালবাবুর ডায়রি। 'গোপালবাবুর'? গোপালবাবু, মানে গোপাল নামটা মাথায় অনেক পরে এসেছিল। তখনো অব্দি সম্ভাব্য কাহিনীর মনোভূমিতে পাক খাচ্ছে 'বিপিন' নামটা।

'বিপিন' নামটায় একটা নির্দিষ্ট ছবি। বিপিনবাবু। স্টিল ব্যান্ড হাতঘড়ি (ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ), বুকে বোতাম লাগানো পাঞ্জাবি : বাংলা শার্ট (হেমন্ত, উত্তমকুমার), হাতা কনুই অব্দি গুটিয়ে ভাঁজ করা, জামাটা সাদা সরু চেক বা হালকা নীল, টেরিকটের (সবচেয়ে টেঁকসই), অফিসে টিএ বিলের বিষয়টায় একটা নিবিড় মনোযোগ : কল্পনাশক্তি। বছরকার পুজোর দিনগুলোয় জামাজুতোর পাশাপাশি কমিশনে একটা শারদীয়া সাহিত্য।

উপরের প্যারাগ্রাফে একটু শ্লেষে ছিলে ত্রিদিব : আক্রমণাত্মক। আক্রমণ, কাকে, কেন? তোমার বড়মেসো — শৈশব কৈশোর জুড়ে যাকে অপছন্দ করেছ? ভোঁতা বলে মনে হত তোমার : রুচিহীন, সংস্কৃতিহীন। যার কিপটেমি, মাসি ও মাসতুতো সন্তানদের উপর, তোমার অসহ্য বোধ হল।

বড়মেসো আসলে কী ছিল : নিপীড়ক না নিপীড়িত?

মাসতুতো বোনের বিয়ের সঙ্গত প্রথানুগততার দায় যাকে পঁয়ষট্টি হাজার খাইখরচ ও শ্বশুরকৌলিক শুয়োরের বাচ্চাদের অর্থনৈতিকতার আনুষঙ্গিকে মোট এক লাখ দশ, মোটামুটি, ঋণে ঠেলে দিল, মাসতুতো বোন কালো ছিল, রোগা, অশিক্ষিত, তাকে বিছানার রৌপ্যপর্দায় দেখে খুব বেশি কারুর কাম উদ্রিক্ত হওয়ার কথা নয়।

বোনের বিয়ে হয়, তারপরই মাসি প্রাকমৃত্যু বছরখানেক গভীর অসুস্থ থাকবে, ভাইদের পড়াশুনো বন্ধ। স্টিলব্যান্ড হাতঘড়ি, নস্যিতে রুমাল ঘন লালচে, খাওয়ার পরই সশব্দে ঢেকুর, বড়মেসো তখন বেত্রাহত কুকুরের মত আওয়ারা :

সেই সময়েই কি তুমি জানতে পারবে অন্য আর একটা সুগভীর অন্যরকমত্ব বড়মেসোর মেরুদণ্ডে ছিল : সরকারি কেরানি হয়েও ঘুষ খায়না, রামপাঁঠা, অফিসে হাসে সবাই, তুমিও ত্রিদিব? কাকে তুমি শ্লেষ করো ত্রিদিব, বড়মেসোরা কেন ওরকমই হয়?

গোপালবাবুও তাদেরই একজন ফল কি ফুল পাড়তে যারা নাগাল-ডাল নামায়। নষ্ট শশা পচা চালকুমড়োর ছাঁচে জন্মিয়াছে যাদের হৃদয়, সে গোপালবাবুও তাদের মত, না কি?

তাও গোপালবাবুর ভিতর একটা অনন্ত উদ্ভাষ। যদিও ঘরেই থাকে, যায়না সেও বনে। গোপালবাবুর দিনগুলি, রাতগুলি তাদের নিজেদের চেহারাতেই স্থায়ী, বর্তমান। তার ভিতর থেকেই গোপালবাবু হাত বাড়ায় বিশ্বচরাচর, ব্রহ্মাণ্ডের দিকে? আলুর অভ্যন্তরে পোকা কুরে কুরে খেত। পোকা কি একদিন দেখল ঊর্ণনাভি দোলাচলে? অষ্টপদ শিকারি অন্টলজি কি মহাসাগর দেখবে? ফেনা, ফেনা, জলরাশি, দেখবে, দেখেছিল পাকা সুপুরি রঙের সূর্যাস্তে পৃথিবীর ভিতর ও বাহির এক হয়, লাভা, ফেনা, রঙ দোলে, সাত রঙ, মোচার খোলার মত দোলে ডিঙা, সপ্ত ডিঙা, সাগর ও অগ্নিগিরি এক হল, ফুজিয়ামা জাপানি তুলিতে কালো সাদা আঁচড়, শান্ত, সাগরে গ্রহান্তর, রঙ, ভিনগ্রহের রঙ, উঠোন সিঁড়ি দেওয়াল বদলায়, গ্রহান্তর, টিকটিকি উঠছিল দেওয়াল বেয়ে, বিস্ফোরণ, পৃথিবী পৃথিবী থাকেনা, আকাশ আকাশ নেই, শরীরের রক্তনালী বেয়ে আষাঢ় আর লাভা, টিকটিকি মেঘে মেঘে উদগীরণ দেখে, মেঘ লাভা ছাই এর পম্পেই, সময় স্তব্ধ হয়, মানুষ টিকটিকি সময়, বিস্ফোরণ, বিস্ফোরণ, বিস্ফোরণ, টিকটিকি দেখে, মানুষ টিকটিকি মানুষ। (টিকটিকি ও মানুষের খানকির বাচ্চারা নিয়ত জন্মাচ্ছে, জন্মাচ্ছে, জন্মাচ্ছে ... অ্যান্ড উই শুড বি ট্র্যাংকুইল অ্যান্ড থ্যাংকফুল অ্যান্ড প্রাউড / ফর ম্যান হ্যাজ বিন এনডাওড উইদ এ মাশরুম শেপড ক্লাউড ...)

বিস্ফোরণ।

দুঃস্বপ্ন?

গোপালবাবু কি চরাচরের স্বপ্ন দেখে, কসমস?

নামেই যা প্রমাণ, গোপালবাবু লোকটা খুবই গোলগোল, তবু তার চোখ ঘোলাটে হয় যখন সে হিমালয় দেখে, ফুল, শিশুরা খেলা করে, ঝড় এসে মাপমতো চৌকোনা ঘরের জানলা কাঁপাচ্ছে, ঝন ঝন ঝন। নইলে সে দিবাকর সেনকে ভাববে কী করে : বিপিনবাবুরা কোনোদিন পেরে উঠল না।

ত্রিদিবের ভাবনায় প্রথম এল ডায়রির কথা। ডায়রি মানেই তার থেকে একটা গোপালবাবু, ডায়রিটা লেখার জন্যে কাউকে একটা চাই। গোপালবাবু আসে।

গোপালবাবু বেঁচে থাকে, খায়, মাথায় তেল মাখে, কোষ্ঠকাঠিন্যে কোঁৎ পাড়ে : অর্থাৎ, একটা পরিপ্রেক্ষিৎ।

গোপালবাবু খেয়ে না-খেয়ে ডায়রি লিখবে, কেউ পড়ল না, তা কী করে হয়? ডায়রির প্রত্যক্ষতায় কারুর একটা আসা দরকার। মিহির এল। মিহিরের বাড়ি। গোপালবাবুর ভূগোল, একই দ্রাঘিমা অক্ষ সমাহার। তখন কাহিনীটা কেবল মাথায় গজিয়েছে, এক বন্ধু আসবে, ত্রিদিব যথারীতি তাকে প্ল্যানটা শোনাল। যতটা তখনো তৈরি হয়েছে, মাথায়। সে শুনে বেশ উত্তেজিত হল (অন্তত দেখে তাই মনে হবে)। আনমনে ভাবে একটু। তারপর বলল, 'চমৎকার। রিটায়ার্ড লাইফ। হেভি পড়াশুনো। একটা উপন্যাস ভেবে ফেলছে। চমৎকার। তবে, এই সাজেশন, ভদ্রলোক লেখে একটু আধটু, আগেই থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ, বটেই তো।' বলে ত্রিদিব। বন্ধুর কাছ থেকে অবসর, রিটায়ারমেন্টের পরিকল্পনাটা পেয়ে গেল। চমৎকার। রিটায়ারমেন্ট এমনিতেই ফাটানো বিষয়। নিশ্চয়তা-নির্ভর অনিশ্চয়তা। জীবন, অর্থনীতি, পারিবারিকতা, সবকিছুর। প্রাকৃতিক বার্ধক্য নিরপেক্ষ সামাজিক বার্ধক্য। বাধ্যতামূলক স্থবিরতা। সারাজীবনের চাকরিসক্রিয়তার সাফল্য যাকে বাধ্যতামূলক করেছে। তুমি সারাজীবন উপভোগ করলে যে তুমি শ্রমের মাইনে খাচ্ছ, শ্রমের মাইনে খাওয়াই সক্রিয়তা, তুমি ভিখিরি নও, কুষ্ঠরোগী নও, আহাম্মক বা পাগল বা বাউল নও : তুমি সম্মানিত সচেতন সক্রিয় মানুষ। ছেলেকেও শিখিয়েছ। তোমার বৌ সক্রিয় স্বামীকে সকাল নটার ভাত খাওয়ানোর অরগাজম পেল সারাজীবন। আজ সবগুলো বছর একসঙ্গে ফিরে আসছে। তোমাকে অপোগণ্ড বলছে। ছুঁড়ে ফেলছে তোমাকে সক্রিয়তার, আধুনিকতার, সুভদ্র আধুনিক জীবনের বাইরে : মার্জিনে, ফুটনোটে। যে নিষ্ক্রিয়তার থেকে দূরে, দূরে তুমি ছুটছিলে, যে ভয়ঙ্কর

পাপের থেকে দূরে, তুমি ছুটছিলে — তুমি আসলে দৌড়ও তিনটে রাস্তার সঙ্গমস্থলে তোমার কাঁচাপাকা-চুল পিতার দিকে, একজন নকিব তোমার মুখে বেত্রাঘাত করে, তুমি পিতৃহত্যা করো, দৌড়তে থাকো থেবাইয়ের দিকে, ইয়োকাস্তের দিকে, মায়ের শয্যার দিকে। অভিশপ্ত জাতির জন্ম দেবে জন্ম দেবে বলে।

অভিশপ্ত?

তুমি দৌড়েছ রিটায়ারমেন্টের দিকে। ক্রমে। ব্যত্যয়হীন। বার্ধক্যে ভয় পেয়ে, সদাসর্বদা, বার্ধক্য তুমি বহন করেছ, যখন তুমি যুবক ছিলে, তখনো। তুমি যুবক ছিলেনা। তুমি বৃদ্ধ ছিলে চিরকাল, বার্ধক্যের ভয়ে, এখন তুমি নিজেকেই ভয় পাও : ঘেন্না।

এই থিমটার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায় কসমিক ফিজিক্স, দিবাকর সেনের গবেষণা।

গোপালবাবু তাই রিটায়ার্ড। তা বলে মাসপয়লায় মিহির ইত্যাদির প্রাপ্তব্যতায় কোনো টান পড়েনি। পেনশন। অবসরকালীন পাওয়া বিরাট অঙ্কের টাকার সুদ। মিহিরদের দেয়। তার সঙ্গে বইকেনা, সিগারেট (এখন গোল্ডফ্লেক), বেড়াতে যাওয়া, ইত্যাদি। যথেষ্ট। আর কোনো ব্যয়সাধ্যতা? মিহির বা ওর বৌ জানেনা। আমরাও জানব না। কাহিনীতে গোপালবাবু একবারো প্রত্যক্ষে আসছে না।

প্রত্যক্ষ চরিত্র মিহির। আর ওর বৌ। বৌ-ই আজকাল গোপালবাবুকে দুপুর আর রাতের ভাত দেয়। সকালের চা। শাশুড়ি মারা কেল, তার আগে বেশ ক-বছর বিছানায় অথবল, কোনোক্রমে পায়খানাটুকুতে যেত, পেচ্ছাপ তো বৌ-ই করাত, কোমরটা পড়ে গেছিল। শ্বশুর বরং অনেক ঝটপট, পড়ল আর মরল।

বদল তো শুধু এই একটাই নয়। সবগুলো কি মিহিরের নিরেই মনে পড়ে? এক দিনে, একত্রে, এককালীন কোনো সচেতন বদল নয়। বদলেছে একটু একটু করে, ধীরে, ক্রমশঃ। বদলের শররে ফের বদল, বদল বদলাতে থাকে। কোনটা বদলেছে আর কোনটা একই ছিল, তাই বা আজ কে বলতে পারে?

যেমন, পায়খানা। গোপালবাবু, মিহির, মিহিরের বৌ সবার ব্যবহারের একটাই পায়খানা : বহু বছর যাবৎ একইরকম আছে, আবার নেইও। পায়খানার বেদিটাকে ব্যবহার করে বাঁপাশে পাকা বাধরুম উঠল, বাথরুমের কলতলা, টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল টেপো আর জল নাও, ঐ মার্চ নাগাদ জলের ফ্লো একটু কম, পুরোনো কুয়ো তো বৌ দেখলইনা, মজে আসছিল, চুন ফেলে ফেলে আর কতদিন, মমতার বিয়ের আগেই বুজিয়ে দেয় মিহিরের বাবা। পায়খানায় জল নেওয়ার আবহমান পদ্ধতিটা অপরিবর্তিত। মগ বদলে বদলে এখন প্লাস্টিক। ছোটবেলার মগগুলো, নারকেল তেলের কৌটো কেটে কেটে, শালিমার, হলুদ জমিতে দুপাশে ঝুঁকে এসেছে নারকেল গাছ, মাঝখানে ভাঙা নারকেল, মিহিরের মনে পড়বে। বালতিটা বদলেছে, না, একই আছে? মিহির নিশ্চিত হতে পারেনা। গোড়ায় লাগানো দাঁড়ানোর সোজা লোহার বেড়টা তোবড়ানো, গড়নটা প্রায় ডিমের মত, বালতিটা কি সে চিরকালই দেখছে? কুয়োর দড়িবাঁধা ছোট লোহার বালতি থেকে জল ঢেলে নিত কি এই বালতিটাতেই? একটা লোহার বালতির আয়ু কত : কুড়ি পঁচিশ বছর?

গোপালবাবুর খাওয়ার ছোট টেবিলে, ঘরের দরজার বাইরেই বারান্দায়, সাদায় নীল ফুল ছাপা টেবিলক্লথ, নাড়ালে মচমচ মচমচ শব্দ, প্লাস্টিকের। এঁটো বাসন তোলে, টেবিল মোছে মিহিরের বৌ। প্রথাটা চালু হল অদূর অতীতে : মিহিরের বৌয়ের হাতে সংসারের নিয়ন্ত্রণ। মিহিরের মা, যত রাতই হোক, গোপালবাবুর খাওয়ার পর থালা বাসন কলতলায় নিয়ে যেত সংসারের অন্য বাসনের সঙ্গে, হলুদ শিখার উপর বহু উপর অব্দি কালো কালি ছড়ানো কাঁপা কাঁপা কেরোসিনের কুপি, রাত্তিরের বাসন রাত্তিরেই মাজতে হবে। মিহিরের বৌ আসে, নিয়ম বদলায়, অসুস্থ শাশুড়িকে দেখাশোনার কাজও বাড়ল, সকালে এখন থেকে পাঁচবাড়ির ঠিকে ঝি, মিহিরও চাইত রাতে বৌ একটু তাড়াতাড়ি ঘরে আসুক, এসময় কিছুদিন গোপালবাবুকে রাত্তিরের এঁটো থালা নিজেই বার করে দিতে হবে। এ নিয়মও চলল না। ইঁদুর, বিড়াল : বাড়ি, বারান্দা এঁটোকাঁটায় মাখামাখি। টেবিল আর চেয়ারের, চেয়ার মানে টুল, বন্দোবস্ত। টেবিল বাড়িতেই ছিল।

এখন গোপালবাবুর দিন বা রাত কোনো বেলাতেই কোনো তাড়া নেই আর, রিটায়ার্ড, বারান্দায় টেবিলে আর টুলে বসে মধ্যাহ্নভোজন, নৈশ-আহার, ধীর স্থির শান্ত, ভাত খায়, রাতে রুটি। মিহির দেখে, মাঝেসাঝে, যখন যখন থাকে।

থালার চতুর্দিকে জলের ছিটে, আঙুলের জটিল স্বাভাবিক গতি, গ্রাস, গলার উচ্চারিত আদমের আপেল ওঠে আর নামে, কত হাজার বছরে এখনো পাকস্থলীতে পৌঁছয়নি — মানুষের গলা থেকে পেটে, খাওয়া শেষে দু-চারটে ভাত খুঁটে খুঁটে টেবিল থেকে থালায়, আর মাঝেমাঝে টেবিলের প্লাস্টিকের মচমচ।

তাদের নিজস্ব গম্ভীর গবেষণার আভ্যন্তরীন মমতা একদিন বলবে, সেই সুদূর অতীতে (কাহিনীতে অপ্রত্যক্ষ), 'লোকটা, জানিস দাদা, বাঁ-হাতে খায়, নয়ত শুধু ঘরের ভিতর দুয়োর দিয়ে খাবে কেন?' — সেই মন্তব্য কি কোনো ছায়াপাত আনে মিহিরের মনে, মজা, গোপালবাবুকে খেতে দেখাকালীন?

ইদানীং গোপালবাবু খাচ্ছে খোলা বারান্দায়, সূর্যালোকে, সকলের চোখের সামনে। অভ্যাসটা, ঘরের ভিতরে একা বাঁ-হাতে খাওয়ার, কী করে বদলাল? আদৌ ছিল কি অভ্যাসটা, কোনোদিন, কোনো অভ্যাস? 'অভ্যাস' বা তার 'বদলে যাওয়া' — কোনো পদের-ই কোনো অর্থ ছিল কি কোনো দিন? থাকবে? অর্থের, সচেতনতার পৃথিবীর বাইরে কোথাও, কোনো অজানায় সংবৃত্ত ও প্রসারমান হয়, ইনকোয়েট ও ফ্লো করে করে 'অভ্যাস' বা তার 'বদল' দুই-ই?

কল্পনার কিছু বাধাহীন উৎসারণ : আর কী অর্থ ছিল মমতার মন্তব্যে? গোপালবাবু অজানা, অজানাকে কেন্দ্র করে গজিয়ে উঠছিল। মমতা গোপালবাবুকে চিনত না, তার মন্তব্যে ইতিহাসের কোনো বন্ধন নেই : যুক্তির, বিজ্ঞানের, নৈয়ায়িকতার (ইহা সভ্যতা হয়, এনলাইটেনমেন্ট)।

অজানাকে মুখোমুখি হওয়ার ঐ কেই রোমাঞ্চ, থরথর, মিহিরের বুক ঢিপঢিপ করবে, গোপালবাবুর ঘরে রুদ্ধদরজার সামনে, দরজা খুলে সে ঢুকছে। এটা কাহিনীর পরবর্তী অংশ, পরে আসছি আমরা। তার আগে এই পরিকল্পনায় আরো কিছু বলে নেওয়ার থেকে যায়।

অর্গলমুক্তি উপাখ্যানে পৌঁছনোর পথে আরো কত কিছু বলার থাকে। গোপালবাবুর অবসরউত্তর সম্পূর্ণ সময়টা। যখন গোপালবাবু বদলে যাচ্ছে তার প্রাক-অবসর কুড়ি পঁচিশটা বছরের তুলনায় অনেক বেশি গতিতে। (বিবর্তন বা বিপ্লব?) পরিবর্তন প্রকাশমান হচ্ছে গোপালবাবুর বাড়ির বাইরে থাকার সময়গত বিস্তৃতি, সংখ্যা এবং অনিয়মে। আগে কি বেরোয়নি গোপালবাবু? বছর দুয়েক বাদে বাদে দশদিন পনেরো দিন। এখন নিজেই চাকরিসক্রিয়তায় অভিজ্ঞ : মিহির নিজেই বুঝতে পারে, ভেবে নেয় সেই পর্যায়বৃত্ত প্রব্রজ্যাকে। এলটিসি। একটা ব্লকের বকেয়া ট্যুর ও টাকা পুরন করে নেওয়া। বাঁধা গরু ঘাস খাওয়ার অ্যাডভেঞ্চ ারে গেল, দূরে, দূরে, আরো দূরে ... (পৃথিবীর কি কোনো সিমেমুড়ো আছে নেই? — বিভূতির গল্পে সিঁদুরচরণ প্রশ্ন করবে, অসীম দূরত্বের সেই কৃষ্ণনগর ভ্রমণের পর, হয়ত নিজেকেই।) ... পিছুটান, দড়ির বন্ধন, ফিরে ফিরে আসে, বাঁধা গরু দেখবে তার চলন-বিচলনের সঞ্চারপথ একটা শূন্যগর্ভ বৃত্ত। বৃত্তের মাধ্যমিক বিন্দুগুলি শূন্য মানে ঘাসশূন্য হল : গরুসক্রিয়তার রূপারোপ; সেই সুদূর সামনের সনের বর্ষা পর্যন্ত।

ট্যুর থেকে ঠিক দিনে ফেরত আসে গোপালবাবু, সারা চাকরিজীবন, বলে যাওয়া দিনের নড়চড় হয়না।

অফিস যাওয়া বা ফেরাতেও, গোপালবাবুর সেই একই রকম। সকাল নটায়, দূরে, কোথাও একটা সাইরেন বাজত। বগলে অফিস যাওয়ার কালো চৌকো ব্যাগ, হাঁটতে হাঁটতেই বড় কালো ছাতাটা অভ্যস্ত হাতে খুলে নেওয়া, অফিসগামী গোপালবাবু মোড় পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে, মনে মনে এক দুই তিন গুণতে শুরু করত মিহির। বেশিরভাগ দিনই একশো পৌঁছতে পৌঁছতে সাইরেনের ভোঁ। মিহির কি প্রায়ই নিজের সঙ্গে একটু চোট্টামি করত? পঞ্চাশ পার হতে হতে গোনার লয় ঢিলে, ক্রমে আরো ঢিলে, সাইরেনের সঙ্গে একশোকে মেলানোর চেষ্টা, নিয়মকে খুঁজে পেতে চাওয়া, ছন্দ?

এই চোট্টামি, এই একই, না-মিলে ওঠা পেশেন্সে কিছুতেই না-উল্টিয়ে উঠতে পারা তাসকে আলগোছে টেনে হাতের তাসে মিশিয়ে দেওয়া, নিয়মছন্দ খুঁজে পাওয়ার চোট্টামি, নিজের সঙ্গে নিজে, তুমি কি নিয়তই করে চলো না, ত্রিদিব? সফল ঝকঝকে মানুষ সামনে দেখলেই, তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে, স্ত্রী বা পুত্র বা অন্য কেউ, তুমি কি শুধুই কোনো বড় মাপের পীড়ন, অত্যাচার খুঁজে বেড়াও না? কেন? তুমি কি পাপ দেওয়ার একটা ভগবান খোঁজো, ছোটবেলায় যেমন বলতে? একটা ভগবান? রোগ শোক জরার পৃথিবীর, ছন্দহীনতার পৃথিবীর উর্দ্ধে কোনো একটা ভগবান?

গোপালবাবুর ফেরাটাও সেই একইরকম। মিহির মমতা পড়তে বসবে কখন সেটাও নির্দিষ্ট হয় গোপালবাবুর ফেরা দিয়ে। একমাত্র কোনো বড়মাপের বেনিয়ম : কোনো দুর্ঘটনা, মমতার পায়েয হয়ত শামুকের খোলা ফুটল বা বাবার

যেবার ভ্যান থেকে মাল নামাতে গিয়ে পা মচকালো, বা আত্মীয়সমাগম, সেটা কমই হত, বা পুজো বা বাড়ির কারুর অসুখ করল, এছাড়া গোপালবাবুর ফেরার আগে বইখাতা খুলে বসে যেতে না-পারলে কপালে সেদিন দুঃখ ছিল।

বদলটা শুরু হয় রিটায়ারমেন্টের পর থেকেই; দিনকে দিন বদলে যেতে থাকে গোপালবাবু। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে একটু একটু করে গোলযোগ, গোপালবাবুর দীর্ঘযাপিত সুস্থিত জীবনচর্যা ভিতরে বাইরে আমূল ফেটে যাচ্ছে দিনকে দিন। মিহিররা দেখছিল।

আজকাল প্রায়ই মিহিরের বৌ গিয়ে দরজা ধাক্কায়, 'কাকাবাবু, ও কাকাবাবু', ওই সম্বোধনটাই ওর অভ্যাস। (এই ডাকা আর দরজা ধাক্কানো, সেই মুহূর্তে কাহিনীর নায়ক মিহিরের বৌ, এইখানেই কাহিনী শুরু হচ্ছে। ডাকা, দরজা ধাক্কানো, তারপরই মিহির আর বৌ টের পাচ্ছে, বা মনে পড়ে যাচ্ছে ওদের যে গোপালবাবু আজো ঘরে নেই। 'টের পাওয়া' দেখাতে হলে এটাও বিবরণে বলে নিতে হবে যে মাঝেমাঝেই মিহিররা ঘুমিয়ে পড়ার মত গভীর রাতে গোপালবাবু বাড়ি ফিরে থাকে। 'মনে পড়া' দেখানো মানে মিহিরের বৌ বেশ অনেকটাই বেখেয়ালি। মেয়েরা, মিহিরদের ঘরের বৌ-রা কি স্বভাবত বেখেয়ালি হওয়ার মত বিলাসের অধিকারী?) 'কাকাবাবু' সম্বোধন করে মিহিরের বৌ। মিহির কোনোদিনই কিছু বলে ডাকেনি গোপালবাবুকে। ছোটবেলায় দূর থেকে দেখত মিহির, চেয়ে থাকত, বাবার জগতের যে কারুর সামনে এমনিতেই একটা বোকা হয়ে পড়ার ভীতি, গোপালবাবুকে আবার বাবার চেয়েও বেশি ভগবান লাগে, বাবা সঙ্কোচে বিড়ি ধরায় না, গোপালবাবু পকেট থেকে বার করে সিগারেট ধরায় — একা। বাবা এই পাড়ারই আরো অনেক বাবাদের মত, গোপালবাবুর কত বই, বই পড়ে। ভারি, মোটা ইংরিজি বই। রোদ্দুরে দেয় মাঝেসাঝে। মিহির বড় হওয়ার পরেও দূরত্বটা কমল-না। বাবা যখন থেকে নেই, কখনো কিছু বলতে হলে 'আপনি, আজ্ঞে' করে কাজ সারে। গোপালবাবু রয়ে গেল দূরত্বের, ভীতির, সমীহের : অজানা।

সকালবেলা, মিহিরের বৌ দরজা ধাক্কায় আর ডাকে, ঘুম চোখে ঘাপটি মেরে থাকে মিহির, শোনে, বেশ কিছুক্ষণ ধরে। মিহিরের ভিতর বিস্ময় গজায়। কমাসও হয়নি রিটায়ার করল, এর ভিতরেই একটা মানুষ, তার অভ্যাস (একটি বিশেষ মানুষ মানে কিছু নির্দিষ্ট মানবিক অভ্যাসের একটি বিশেষ সমাহার), এত বছরকার অভ্যাস এতটা বদলে যাচ্ছে? মানুষের তো সকালের পায়খানাতেও সমস্যা হয়, মিহিরের যেমন, সকালের দু-গ্লাস জল আর গুড়াখু বাদ দাও : কড়া জোলাপেও মাল খালাস হবে না।

মিহিরের ছেলের (বড় ছেলে না ছেলে একটাই মাত্র?) বয়স হতে চলল ছ-বছর। ওর দুধের বয়সটাতে, বলতে গেলে রোজই, মাঝরাত্তিরে কেঁদে উঠত। বৌও জেগে যেত সঙ্গে সঙ্গেই। ঘুম ভেঙে গিয়েও বৌ-এর হাতশরীর নড়তে চাইত না, ক্লান্তি, বাচ্চা হওয়ার ধকল, রক্তহীনতায় রুগ্ন ফর্সা হয়ে গেল ওই সময়টায়, বাদামি স্তনবৃন্ত, চামড়াটা ফাটাফাটা, দু-একটা শিরা স্পষ্ট হয়ে আছে, সব হুক না-লাগানো ব্লাউজ থেকে বার করে ছেলের মুখে গুজে দিত, ঘুমের ঘোরেই, চোখটাও খুলত-না। পরে, কতদিন অব্দি, রোজ রাতে, মাঝরাত্তিরে জেগে উঠত মিহির। দূরে কোথাও, হয়ত স্টেশনের কাছে শিবমন্দিরে সময় অনুযায়ী ঘণ্টা পেটে, দুটোর সময় পরপর দু-বার ঘণ্টার আওয়াজ, একটু পরে বাড়ির আমগাছে কি কাছেই আর কোথাও রাতচর পাখি ডাকল, গুবগুব গুবগুব, চাঁদনি রাতে দু-একটা কাকও ডেকে ওঠে, নিজের অজান্তে ফের ঘুমিয়ে পড়ে মিহির। ঘুমিয়ে পড়ার আগে একবার হাত বাড়িয়ে দেখে নেওয়া, ঘুমের ঘোরে বৌ-এর হাতটা গিয়ে বাচ্চার গলায় পড়েনি তো, অফিসে মাঝে শুনেছিল কার একটা বাচ্চা ওইভাবে মারা গেছে। এখনো, কখনো সখনো, মাঝে সাঝে, ওই সময়ে ঘুম ভাঙে মিহিরের : মানুষের অভ্যাস কি এত সহজে যায়?

(এই ভাবেই, শেষ কিছুক্ষণ যেমন, এগোবে মূল কাহিনী। মিহিরের জীবন, চিন্তা, টুকরো টুকরো ঘটনা, এলোমেলো, মিশে মিশে যায়, মিশে থাকে গোপালবাবুর রেফারেন্স, সূত্রনির্দেশ।)

গোপালবাবুর এই বদল মিহিরকে বিস্মিত করে। আপনা থেকে কেউ এরকম বদলে যেতে পারে, এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি?

এরকমটাই ভাবে মিহির, কাহিনীর এই অংশে।

কাহিনীর এই অংশটা এমন ধরনে লিখবে ত্রিদিব, মিহিরের ভাবনার বিবরণ, যাতে গোপালবাবুর বদলে যাওয়ার একটা সচেতন, স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াস মিহির টের পাচ্ছে কি পাচ্ছে-না এই টেনশন কাহিনীতে তৈরি হয়। পড়তে পড়তে পাঠকও টেনশনের আভ্যন্তরীন হয়ে পড়ে। (টেনশনটা কার, মিহিরের না ত্রিদিবের?)

গোপালবাবুর বিশৃঙ্খলা কি স্বেচ্ছাকৃত? যদি স্বেচ্ছাকৃত তো কেন? বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে ? কিসের? গোপালবাবুর জীবন : শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মতান্ত্রিক : গোপালবাবুর স্বনির্বাচিত। বিদ্রোহ তবে কার বিরুদ্ধে ? নিজের?

অথবা, গোপালবাবুর স্বনির্বাচন একটা রূপকথা? অন্য যে কোনো মানুষের কাজ স্বনির্বাচনের, সরকার স্বনির্বাচনের, প্রেম স্বনির্বাচনের গনতান্ত্রিক অধিকারের রূপকথার মত?

স্বনির্বাচন না সমাপতন?

বিদ্রোহেই হোক, আর সময়ের নিজস্ব অবক্ষয়ে : বিদ্রোহহীনতায়, গোপালবাবু ক্রমে বিশৃঙ্খল হয়ে যেতে থাকে। একটানা চার-পাঁচ দিন বাড়িতে অনুপস্থিতি, কোনো রকম কোনো ঘোষণা ব্যতিরেকে। মাঝে মাঝে মিহিরের বৌ এই নিয়ে মৃদু ঘ্যানঘ্যান করে। মৃদু। লোকটার আজকাল কী যে হচ্ছে! সারাটা দিন, শনিবার আজ, সেই সকাল থেকেই তাড়াহুড়ো, সব কাজ গুছিয়ে রাখল বৌ, পাশের বাড়িতে সন্ধের সিনেমাটা, আজ হিন্দি, দেখতে যাবে : এখন কতটা চাল সে বসায়, ক-জনের ভাত? লোকটা যদি ফেরে, ভাত পাবেনা তা তো হয়না, আর যদি না-ফেরে? মিহির তখন বাড়িতে নেই, অফিস থেকে আর কত আগে ফেরা যায়, বৌ নিজের মনেই বকে। হঠাৎ এসে পড়া লোকজনকে যে হঠাৎ ভাত রেঁধে দেওয়া যায়না, আগেও দিতে হয়নি বৌকে, দিতে যে সে খুব অখুশি হয় তা নয়; তাও এতো বক বক করে কেন বৌ, ঘ্যানঘ্যান, নিজের মনেই? একটা নিয়োগ? নাকি একধরনের উদ্বেগ, শূন্যতা? কী হল — লোকটা ফেরেনা কেন — যাবে কোথায় — কোথায় যেতে পারে? মাতারা হোমিও, ওই চৌমাথার ওখানে, কাঁচাপাকা-চুল ডাক্তার, তার থুজা দুশোয় খসে গেল আঁচিলটা, ঘাড়ে হাত দিলে জায়গাটা খালিখালি লাগে, ফাঁকা, শূন্যতা।

এই এতক্ষণ যতটা পড়লেন আপনারা পরিকল্পনার, এর পুরোটাই কাহিনীতে পরোক্ষ। ঘুরপথে, আভাসে, অভিক্ষেপ হিসাবে। প্রত্যক্ষে নয়।

কাহিনীর যথার্থ বিবৃত সময় এবং বিবৃত ঘটনায় কাহিনীটা ঠিক কিভাবে ঘটবে? সেটা এবার দেখি, আসুন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রত্যক্ষ ঘটমানতা।

।। দুই ।।

পরিকল্পনার প্রথম খসড়াতেই ছিল, একটু আগে 'পরিচ্ছেদ এক'-এ সেটা উল্লেখ করা হয়েছে, কাহিনীর গোড়াতেই মিহিরের বৌ-এর আবিষ্কার : গোপালবাবু ঘরে নেই।

দ্বিতীয় খসড়াটা লিখছে, আর ত্রিদিবের মনে হচ্ছে, কী যে শালার লেখে সে, বহুদিনকার নিকট বন্ধুদেরই তার কোনো লেখা পড়ার কথা উঠলেই কেমন নার্ভাস দেখায়, তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ে, গাছের, শিশুশ্রমের, এইডস-এর। জিগেশ করে জেনেছে ত্রিদিব : বড্ড বোর লাগে। কোনো গতি নেই। এবার, এই কাহিনীতে, ত্রিদিব একটু গতি আনছে।

প্রথম বাক্যটাই হবে খুব নাটকীয়। প্রত্যক্ষ, সরাসরি, উচ্চকিত।

এরকম কিছু একটা, 'গোপালবাবু ফিরছে না, কতদিন হয়ে গেল'।

'অনেকদিন'-এর মত একটা স্ট্যাটিস্টিকাল, ঢ্যামনা শব্দ নয়।

'কতদিন'। একটা প্রকাশাকাঙ্খী আবেগরণিত সিডাক্টিভ শব্দ।

(বাক্যটা লিখছে, আর ত্রিদিবের মনে হচ্ছে : বাক্যটার পিছনে, চিন্তাকারীর অবয়বে একটি নারী : সে দেখল, দেখতে পাচ্ছে। গৃহকর্মরত, মৃদু মানবীমেদের নিচে ক্রিয়াশীল পেশি হাড় স্নায়ু ও রক্ত, পরনের ব্যবহৃত শাড়ি অল্প ময়লা, শিথিল নরম কোমল, নারীত্ব : মিহিরের বৌ, মিহিরের ছেলের মা, আর এক মিহিরের?)

কাহিনী এগোয়, গোপালবাবুর না-ফেরা, উৎকণ্ঠা। মিহিরের পারিবারিক জীবন, মিহির এবং তার বৌ-এর পারস্পরিকতায় কতকগুলো নড়াচড়া : গোপালবাবুর এই অনুপস্থিতি। নিকট অতীতের সাপেক্ষে হয়ত মোটামুটি মানানসই; দূর অতীতের সাপেক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হওয়া মানেই — ওঠো,

কিছু করো, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে আর তুমি চুপ করে বসে আছ? করো কিছু : পুলিশ ডাকো, বা ডাক্তার, নিদেন পক্ষে একপিস নেতা। পুলিশের কাছে যাওয়া মানেই অবশ্য নেতার কাছে যাওয়া, আগেই। নেতার সঙ্গে না-গেলে কোনো পুলিশ ডায়রি নেয়? ডায়রির গল্প শালা রাত পোহালে, নেতাদৃষ্টিবঞ্চিত কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো পুলিশ কুকুর-তাড়ানোর ভঙ্গীতে ছাড়া কথা বলে?

গোপালবাবুর এই অনুপস্থিতিটা — স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক — কোন চোখে দেখবে, মিহির আর ওর বৌ ঠিক করে উঠতে পারছে না। কাহিনীর প্রথমে বড় একটা অংশ জুড়ে এই উৎকণ্ঠা : ওদের ভাবনা, চিন্তা, প্রতিক্রিয়া জানতে জানতে আপনি, মানে পাঠক, প্রথম পরিচ্ছেদটা (মূল কাহিনীর) পড়ে ফেলছেন।

এখানে একটা দ্বিধা। ছোট্ট।

কী আসবে কাহিনীতে? শুধু মিহিরের চিন্তা? নাকি বৌ-এরও? মিহিরের চিন্তার ফাঁকফোঁকর গলে দু-এক ঝলক বৌ-এর চিন্তার অচিন পাখিও জাস্ট শো করিয়ে দেওয়া — সেটুকু করাই যায় — যতটা মিহির টের পায়, বুঝতে পারে তার বৌ-এর মন, ত্রিদিব যতটা মিহিরকে দিয়ে বুঝিয়ে নিতে চায়। (পরিকল্পনা, যেটা আপনারা পড়ছেন, এই দ্বিধার চিহ্ন বহন করছে। এতক্ষণ যাবৎ আমাদের অজস্র উল্লেখে বিরক্তিকর ভাবে 'মিহিরের বৌ', 'মিহিরের বৌ' করে চলা হয়েছে। কেন? ভগবানের ইচ্ছেয় তার কি কোনো নাম নেই?) কাহিনীটা লিখে উঠতে আশা করা যায় দেরি আছে। তদ্দিনে এই দ্বিধাটুকু ত্রিদিব কাটিয়ে উঠবে।

উৎকণ্ঠার বর্ণনা মানে জ্যান্ত সময়ের বর্ণনা : মিহির আর মিহিরের বৌ। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ধারাবাহিকতা। (পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় ত্রিদিব শব্দটা লিখেছিল 'সামগ্রিকতা'। এখন তার মনে হল, 'সামগ্রিকতা', 'সমগ্র' বলে আদৌ কি কিছু থাকে? থাকে শুধু ঘটমানতা, ধারাবাহিক, ঘটে চলতেই থাকা। কেন?) তাদের রোজকার জীবন। তার ভিতরেই উৎকণ্ঠার ধারাক্রম। মিহিরের পরিবারের জ্যান্ত বাস্তবতাটা কাহিনীতে চলে আসছে। ছোট ছোট উপাদান : মিহির আর মিহিরের বৌয়ের ব্যক্তিত্বের রক্তমাংস।

রক্তমাংস নিয়ে হাজির হওয়া একটা মানুষের চরিত্র বর্ণনা, বর্ণনা মানে ঘটনাধারা, ঘটনা : যাদের বানিয়ে তোলা হল, লেখক বানাল, তৃপ্তি পাচ্ছে, নিজেকে ভগবান বলে মনে হচ্ছে, ভগবান-ভগবান খেলা। (এর আগেই তোমার যে উপন্যাসটা, 'ভ্রমণ-উপকথা', যেটা কেউ কোথাও কিছুতেই ছাপল-না, তাতে তুমি লিখেছিলে, 'আমি নতুন ভাষার জন্ম দিই : আমিই পরমব্রহ্ম'। এটা শেষ লাইন। ছাপা হয়নি। কেউ পড়ল-না। পাঠক ব্রহ্মজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হল। হায় পাঠক, তোকে শালা কে বাঁচাবে?)

কাহিনীর এই অংশে সেই ভগবান-ভগবান খেলাটা খুব জোরদার। একটু দেখে নিই, আসুন।

উদাহরণ : তরকারি, কোটা হচ্ছে, মিহিরের বৌ।

মিহিরের বৌ তরকারি কুটছে। রান্নাঘরের ভিতরে আলো কম। সকালবেলাটায় বাইরের দিকে এগিয়ে এসে তরকারি কোটে বৌ। বাইরে সকালের আলো, যতটা পাওয়া যায়। চোখের কাজ যেগুলো : সরু সরু বৃত্তচাপের পেঁয়াজকুচি, পুরনো আলুর বা একটু শুকিয়ে আসা আলুর ছাল ছাড়ানো, উঠতেই চায়না একদম, বেশ সুবিধে হয়। আর চোখের কাজ হোক ছাই না-হোক, আলোতে কাজ করতেই আরাম।

দরজার দিকে এগিয়ে বসেছে, নিচুমুখ, একমনে বঁটির গায়ে ঝিঙের শির ঘষে, বৌকে মিহির দেখতে পাচ্ছে। বৌও দেখতে পায়, যদি চোখ তোলে। বৌ দেখল মিহির বসে আছে, ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে, হাতে লালের উপর সরু নীল দাগ চেনা সিগারেট প্যাকেট।

বৌ বলে ওঠে, 'কী হল, বাজার গেলে না?'

'হুঁ' বলেও নিরুত্তর মিহির। তাকিয়ে থাকে আয়নার গভীরে। সাত-আট ফুট দূরে যেহেতু আয়নার সাথে তার দূরত্ব ফুট চারেক প্রায়, গলার কাছে টাল হাতের কাছে টাল অন্ধকারতর একজন মিহিরের হাতে সিগারেট প্যাকেট নড়ছে। লালের উপর সরু নীল দাগ — কিন্তু বড্ড অন্ধকার আবছা।

ভগবান-ভগবান খেলার গোপন খুঁটিনাটিগুলো এই কাহিনীতে ঠিক কী চরিত্র পাচ্ছে সেটা এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করে রাখা যাক। শেষ অব্দি, কত দিন পরে কে জানে, কাহিনীটা লেখা হলে যেন মনে না হয়, খুঁটিনাটির পিছনে ভাবনাগুলো গুলিয়ে গেছে, আসলে এরকম ছিলনা।

(যদি বদলে যায়ই, ক্ষতি কী? কেন ত্রিদিব এই কাহিনী মানে এই কাহিনীটাই লিখতে চায়, কাহিনীর পিছনের কাহিনী সমেত? কেন? সব কাহিনীর পিছনেই তো একই কাহিনী, সব কাহিনীই তো একই কাহিনী? সব কাহিনীর পিছনেই তো এক লেখক, একই ত্রিদিব?)

ভগবান-খেলার পরিকল্পিত খুঁটিনাটি :

(ক) লালের উপর নীল সরু দাগ সিগারেট প্যাকেট — চার্মিনার স্পেশাল। মিহির চার্মিনার স্পেশালের লোক; বিড়ির বা চার্মিনারের নয়; উইলস ফিল্টারেরও নয়।

(খ) মিহিরদের ঘরে/রান্নাঘরে আলো আসে কম। বিশেষত সকালে। তাও বৌ রান্নাঘরে আলো জ্বালায়নি, মিহিরও ঘরে বসে আছে প্রতিবিম্বের চারপাশে অন্ধকার নিয়েই। বরং বৌ তরকারি কুটতে দরজার দিকে একটু এগিয়ে এল। একটি বিশেষ জীবনচর্যার নিরিখে এই ব্যবহারবিধি খুবই প্রাপ্তব্য।

(গ) মিহিরের বৌ বটির গায়ে ঝিঙের শির ঘষে। টমাটো, ক্যাপসিকাম, গাজর? বৌ কখনোই কোনো এলিট তরকারি কোটে-না তা নয়। তাহলে? ঝিঙেই কি সেই শ্রেণীচিহ্নক আনাজ ত্রিদিব যার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে চেয়েছিল?

(ঘ) আয়নায় দু-বার টাল-খাওয়া প্রতিবিম্ব : আয়নার প্রতিফলক তথা আয়নাটায় খুঁত। এটা (খ) বা (গ) থেকে পৃথক কিছু নয়। মিহিরের সামাজিক ভূজ ও কোটিকে স্পষ্ট করে তোলার আর একটা চিহ্ন। টাল আছে মানে টাল থাকার মত আয়নাও আছে। আয়না নয় : ড্রেসিং টেবিল। যা আয়না নয়, টেবিল নয়, টুল নয় — এমনকি কোনো আসবাবই নয়। ড্রেসিং টেবিল মানে ড্রেসিং টেবিল খাট নতুন তোষক, শীতকাল হলে নতুন লেপ, আংটি হার কানের দুল ইত্যাদি দু-চার ভরি সোনা, মেয়েকে কি আর শুধু হাতে সম্প্রদান করা যায়, ড্রেসিং টেবিল মানেই নতুন ড্রেসিং টেবিলের বন্ধ নিচের ড্রয়ারে আইবুড়ো জীবনের সবচেয়ে রহস্যের সামগ্রী — না, না, কন্ডোম নয়, 'নিরোধ' রাখতে শেখা। ড্রেসিং টেবিল মানে নতুন কনের কাছে একটা দ্বীপ, শুধু সাজতে পারার সুখ নয়, চারপাশের সমস্ত বিজাতীয় নতুনত্বের মধ্যে, যা আক্রমণ, একমাত্র কিছু যা তার নিজের, যা তার বাপের বাড়ি থেকে এসেছে, তাই, আরো নিজের। তার একমাত্র প্রাইভেসি। (দানসামগ্রীর আলমারিতে শাড়ি জামাকাপড় ঢোকায় ননদ শাশুড়ি সবাই, সববাই হাত দেয়।) সেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলক পালিশে টাল। মিহিরের অতিক্রান্ত দাম্পত্য সময়টাই কি তুবড়ে গেছে? নাকি ওই টাল সবারই থাকে?

এইসব পরোক্ষ এবং ততটা-পরোক্ষ-নয় প্রতিস্থাপনে কাহিনীর শরীর গড়ে উঠছে। বক্তব্যের মূল খাতটা একই : উৎকণ্ঠা : গোপালবাবুর অনুপস্থিতি। একটা টানটান সময়, নির্মিত হয়ে চলেছে। (কোন শুয়োরের বাচ্চা না বলেছিল ত্রিদিবের লেখা বোরিং?) একটা টানটান সময়, অনিশ্চয়তাটা বেড়ে উঠেছে। এতটা বেড়ে উঠল যে মিহির এমনকি বাজারও গেলনা। (মিহিরদের নিশ্চিতভাবেই ফ্রিজ নেই)। বাজার করা ফেলে অন্যমনস্ক মিহির থমথমে মুখে বসে আছে। 'অজম্ভুতের মত', বৌ একটু আগে নিজের মনেই বিড়বিড় করেছে, কাউকে শুনতে না-দিয়ে, উচ্চারণকালীন অনুযুক্ত বিরক্তিতে বেঁকে যাওয়া ঠোঁটে তাকে একটু বালিকা দেখিয়েছিল।

দ্বিতীয় খসড়াটা লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, উদ্ধৃত অংশটায় আরো একটা বিষয় এসে গেছে (ত্রিদিবের অসচেতনেই?), যেটা মূল কাহিনীতেও রেখে দেওয়া যাবে : সংসারের সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার, সামনা করার নারী-রকম আর পুরুষ-রকমের পার্থক্য। পরিস্থিতি যাই হোক, সঙ্কট অথবা উৎসব, নারীকে তার সাংসারিকতায় রত থাকতেই হবে। পুরুষকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে, নারী সেটা জানে।

চাকরিটা পুরুষের জীবনে বাধ্যতা। চাকরিতে বেরনোর সময় হয়ে গেল, নটা দশের দত্তপুকুর লোকাল, কিম্বা যশোর রোড থেকে এই সময়ে কল্যাণী এক্সপ্রেস বা ন-মাসে ছ-মাসে কোনোদিন চার্টার্ড বাস, অথবা এমনিতে লোকাল বাস তো আছেই; ভাত এখনো নামল না, ভগবান আমি এখন কী করি, তেলের শিশিটাই বা কোথায় রাখলাম, আর পারিনা, খুন্তি; নারীকে ভাত রেঁধে দিতেই হবে : অফিসের ভাত।

মিহির তো শেষ অব্দি বাজারে গেল-ই না, বৌ এখন কী করে?

ওই যে ঝিঙে কুটছে, ওর সঙ্গে আলু আর পোস্ত দিয়ে কোনো রকমে একটা চচ্চড়ি, সর্ষের তেল আর কালোজিরে তো ঘরেই আছে। জল একটু কম দিয়ে কড়াইয়ে বাটি ঢাকা দিয়ে করলে আরো একটু তাড়াতাড়ি, কিছু একটা তো করে দিতেই হবে। বা, পুরুষমানুষ কি আর একটা পদ দিয়ে খেতে পারে, আরো সারাদিন অফিস আর ডেইলি প্যাসেঞ্জারির ধকল, মিহিরের বৌ হয়ত পোস্ত না-দিয়ে শুধু ঝিঙে-আলুর চচ্চড়ি রাঁধে, আর ফুটন্ত ভাতের উনুনের পাশে শিলনোড়ায় ঝটপট কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পোস্ত বাটে, ভাত নামলে মায়ের দেওয়া ছোট্ট চকচকে পিতলের কৌটোয় (কৌটোটা হাতে নিলেই বৌ ওর মায়ের মুখ দেখে রোজ, হলুদ পিতলের তলে, সস্নেহ সহাস্য মুখ, মুখ যা বৌ শৈশবে দেখেছিল কোনো এক দিন) কাঁচা তেল মেখে গরম ভাতের ভিতর বসিয়ে দেবে।

ঘরকন্নার কাজ করতে করতেই মিহিরের বৌ মিহিরের থেকে অনেক বেশি ইতিহাসকে অর্জন করে ফেলে। ধারণ করে ইতিহাসকে। শোকই হোক, বা বেদনা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, তাকে তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতেই হয়। মিহিরের বৌ মিহির নয় যে আর সব জায়গায় আক্রান্ত হওয়ার পর জবাবদিহি চাওয়ার মত তার একটা বৌ থাকে। সে নিজেই একটা বৌ।

কাহিনীর বিবরণে তাই মিহিরের তুলনায় মিহিরের বৌ অনেক নিস্তরঙ্গ। কাজের ধারাবাহিকতার নিস্তরঙ্গতা।

কাহিনীর এই অংশে আরো কিছু সম্ভাব্য ঘটনা, কিছু ডিটেইলস : মিহির আলোড়নে আছে। খুঁটিনাটিগুলো ঠিক কী হবে? লেখা মানেই তো নিয়ত নতুন ডিটেইলস গজিয়ে উঠতে থাকা। তার চরিত্র হতে পারে নানা রকম। এখন মাথায় নেই এমন কোনো খোঁচ, মোচড়, উৎকেন্দ্রিকতাই হয়ত হঠাৎ গজিয়ে গেল।

ধরুন, মিহির আজ দোকানে গেল কি? না, যায়নি। তো, কী করল আজ সারাটা দিন? সেই পৈতৃক দোকান, উত্তরাধিকার, বাবারা তো কিছু দিয়ে যায়ই, এই নরদেহ, দেহের আনুষঙ্গিক, গয়না দোকান তৈজসপত্র, দোকানেও কি বসল আজ মিহির? না তো। মিহির আজকাল অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, সরকারি অফিস, সন্ধেটা কাটায় দোকানে, ওই সময়টাই ভালো বিক্রি, দোকানের কাজের ছেলেটার সোনায় সোহাগা একা বসতে পেরে। সেই দোকানেও যায়নি, সারাটা সন্ধে আজ একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে মিহির। ('হেঁটে বেড়াচ্ছে'? সামনের যে রাস্তা, পাড়ার লোকজন, জন্মের থেকে সেই একই লোকজন, তাদের মুখোমুখি, জিজ্ঞাসা : 'কী ব্যাপার, হেঁটে বেড়াচ্ছ', তা যদি নাও হয়, হেঁটে বেড়ানো — পায়চারি — বৈকালিক — অবিস্রস্ত, অধৈর্য মন — অনুষঙ্গটাই কি মিহিরের থেকে উচ্চতর কোটির মানুষের নয়? ত্রিদিব এখন যে কোটির?)

এই সমস্ত মুহূর্তের সব মোচড়কে ধরা, ধরা যায় এমন ডিটেইলস, ডিটেইলস সেইসব কথা বলে দিতে পারে, তার নিজের রকমে, এমন ডিটেইলস তুমি খুঁজছ? পারে কি ডিটেইলসরা বলতে সেই কথা, কোনো কথা?

ইতিমধ্যে সময়ের গাছ বাড়ে, আরো বাড়ে, বৃদ্ধি, উন্নয়ন, নরদেহ মরে সার, কঙ্কালের হাড়ের নিচেই হৃদপিণ্ড ছিল, যন্ত্রণায় বন্ধ হয়ে যেতে চাইত? হাড়ের গায়ে হাত রাখো, টের পাও?

এরকমই একটা মোচড়, মাথায় আসে, আসামাত্রই ত্রিদিবের ভালো লেগে গেছে। কেন লাগল? মোচড়টার শরীরে কি প্রকৃতির গন্ধ, হিমালয়ের, আকাশের, বিশ্বপৃথিবীর : দিবাকর সেনের? আকাশ যা আকাশই ছিল, সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণে আলোকিত, সূর্যাস্তের পরও কিছুক্ষণ আলো ধরে রাখে বায়ুমণ্ডল : আকাশ, আকাশ সেই আকাশ যা আলোকিত হয় সেই মুহূর্তেও যখন ত্রিদিব বন্ধুকে ঠকাচ্ছে, উৎসবের বর্ণছটায় আলোকিত হচ্ছে, কিম্বা, অন্যের মৃত্যুকে আহার করছে : বেঁচে থাকছে।

মোচড়টা লিখে রাখা যাক।

কিছুই না : একটা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স।

মিহির অনেকক্ষণ ধরে টানাপোড়েনে দুলছে, দ্বিধায় অস্থির। দরজাটা খুলি, না না খুলব না, খুলি না — কী হয়েছে, না খুলব না, খুলেই ফেলি ... । গোপালবাবু যদি আজই ফেরে?

'আমার ঘর কে খুলল?'

'না, মানে — ইয়ে, ও বলল যে দামি জিনিষ আর কী থাকবে, না মানে ব্যাংকেই তো আপনার ... '।

'খুলেছ কেন আমার ঘর — আমি যদি তোমায় পুলিশে দিই?'

কিম্বা যদি ঘর খুলে দেখা যায় ডেডবডি, গোপালবাবু কাউকে একটা খুন করে উধাও হয়ে গিয়েছে?

দ্বিধা, চিন্তা, অস্থিরতা, মিহির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, কিছুক্ষণ, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ঘর খুলবে, খুঁজে দেখে নিয়ে দরজাটা ফের বন্ধ করে রেখে দেবে। গোপালবাবু টের পাবে কী করে?

কাহিনীর এই অংশে মনোযোগের বিন্দু — মিহিরের অন্তর্দন্দ্ব। অন্তর্দন্দ্ব ১ : দরজাটা খুলবে কি খুলবে না : ঔচিত্যবোধের অন্তর্দন্দ্ব। অন্তর্দন্দ্ব ২ : দরজাটা সে, মিহির, কেন খুলতে চাইছে, আসল কারণটা কী, উধাও গোপালবাবুর কোনো সম্ভাব্য বিকল্প ঠিকানা জানতে চাওয়া, নাকি নিজের আশৈশব কৌতূহল চরিতার্থ করা : আত্মসচেতনতার অন্তর্দন্দ্ব।

অন্তর্দন্দ্বের টানাপোড়েনে ওলটপালট মিহির একটু টানটান থাকে। বৌ-এর খুব নির্দোষ কোনো কথাতেই খিঁচিয়ে উঠল। তারপরই, একঝলকে বদল ঘটে এইরকম মুহূর্তেই : পৃথিবীর, সমাজের : বিপ্লব (জনগনতান্ত্রিক হোক বা সমাজতান্ত্রিক বা নিদেন আমিষবিপ্লব), তার পরই এক ঝলকে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে : হাত বাড়ায়, বাড়ানো হাত চাবিটা মিটসেফের গায়ে পেরেক থেকে তুলে নেয়। 'দিওয়ার' ফিল্মে অমিতাভ বচ্চনের দলিল ছিড়ে ফেলবার এপিকতা। কিম্বা 'ডর' ফিল্মে শাহরুখ তার প্রেমিকা-শত্রুকে, প্রেমিকার মত শত্রু আর কোথায়, বহুতলের ছাদ থেকে বহুতল শূন্যতায় আমনে-সামনে করে দেওয়ার মহাজাগতিকতা।

মিহিরের হাত চাবি তুলল। চাবি নড়ছে : ডিটেইল, আঙুলের মধ্যে। মিডশট, গোপালবাবুর বন্ধ দরজা কাট টু ক্লোজ, মিহিরের উর্দ্ধাঙ্গ ঝুঁকে পড়েছে দরজার উপর। কাট দরজার কড়া আর তালা কাট হাতের আঙুলে চাবি কাট মিহিরের একমুখ মনঃসংযোগ।

তখন-ই অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। ছোট্ট।

বাঁ-হাত তালায় দেওয়া মাত্রই মিহির বুঝতে পারল, তালাটা দিয়ে দরজাটা আদৌ বন্ধ করা নয়। ছোট, চৌকো, অল্প জং-ধরা, আসলে নীল, একটু লম্বাটে উঁচু উঁচু অক্ষরে 'ক্লিপকো' লেখা, হালকা টিপ-তালাটা আদৌ বন্ধই নয়। কড়া দুটোয় জাস্ট ঢোকানো। চাবির সঙ্গে এই মুহূর্তে তালাটার কোনো সম্পর্কই নেই।

একটু কি দুলে উঠবে মিহির, একটু কি দুলে উঠল মিহিরের ভুবন?

চুরি টুরি হয়ে গেল কিনা এই ধাক্কাতেই, হয়ত, তড়িৎগ্রস্ত মিহির কি একটু ককিয়ে ওঠে? বৌকে ডাকে? বিপদে ককিয়ে উঠে ডাকার জন্যে, শিশুবয়সে মাকে ডেকে ওঠার অভ্যেশ, বৌ — বৌরা তো থাকেই।

এই অংশটা লেখার সময়ে বাক্যগুলোয় একটা প্রবহমানতা। এই প্রবহমানতা তার নেই, জানে ত্রিদিব। গল্প-উপন্যাস উপন্যাসোপম বড় গল্পর প্রবহমানতা। সে এটা অর্জন করবে। বেশ কিছু গল্প, উপন্যাস, সত্যিকারের সফল, জনপ্রিয় লেখকদের, কিনে আনবে। খোদ পাবলিশারের ঘর থেকে, কমিশনে। আলাদা করে লেখক খুঁজতেও হবে না। একটা পাবলিশার : লেখার একটা জেনার, লেখকের আলাদা নামটা বাহুল্য, প্রবহমানতা। কষে পড়বে লেখাগুলো। বারবার। নোট করবে। আবার পড়বে। অর্জনের কাজটা সহজ নয়। এক-এক জন লেখক একই কাহিনী পঞ্চাশ বছর ধরে লিখছেন। পঞ্চাশ বছরের সাধনায় কী না হয়? মানুষ ডিমের খোলা না-ফাটিয়ে কুসুম বার করে আনতে পারে। সেই কুসুম-প্রবহমানতার নিদেন এক অঞ্জলি অর্জন তাকে করতেই হবে। কাহিনীর এই অংশে।

কড়ায় ঝুলতে-থাকা অকারণ তালার সামনে মিহিরের বিস্ময়, বিপন্নতা, আহ্বানে ছুটে আসা মিহিরের বৌ-এর ব্যবহার : পুরোটাই একটা নিটোল বাস্তবতা, সত্যিকারের সত্যি গল্পের মত করে তুলতে চাইছে ত্রিদিব।

মিহির ডেকে দেখায় তালাটা। ওর বৌ কাজ করছিল, হঠাৎ ডেকে আনার বিস্মিত বিরক্তি কি বৌ-এর মুখে ছায়া ফেলে এখন, ভেজা হাত আঁচলে মুছতে মুছতে বলেছিল, স্বাভাবিকতা এমন যেন এতক্ষণের কাজটাই এখনো করে চলেছে, ডালের কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ছে, খুব প্রাত্যহিক কোনো তথ্য জিজ্ঞাসা করে জানতে চাওয়ার বিপরীতে যেমন, 'ও তালাতো খোলাই থাকে। লাগানো থাকে না তো, অনেকদিন হল।'

মিহির স্তম্ভিত : ধীরে ধীরে জানতে পারবে পুরোটাই। তালাটা সবসময়ই এরকম ঝোলে আজকাল। কড়াদুটো বাঁধা থাকে পুরোনো একটা শাড়ির পাড়ে, মিহিরের বৌ-ই দিয়েছে। শেষ বার যখন তালার চাবি হারালো আর তালা ভাঙা এবং নতুন তালা কেনার ঝামেলায় যেতে চায়নি গোপালবাবু। কোনোক্রমে খোঁচাখুঁচি করে তালাটা একবার খুলে ফেলা, তারপরই এই শর্টকাট সমাধান। 'আর ও ঘরে ছাই আছেই বা কী যে তালা দিতে হবে?' কথাটা কি মিহিরের বৌ নিজে বলেছিল, না গোপালবাবুকে উদ্ধৃত করেছিল?

মিহির জানতে পারেনি, তার অস্তিত্বের আভ্যন্তরীণ হয়ে পড়া, তারই সমভিব্যাহারে বয়োপ্রাপ্ত এবং পরিণত হয়ে ওঠা রহস্য নিজের দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছিল মিহিরের জন্য : যে খুলে ঢুকতে চাইবে তারই জন্য। মিহির জানতে পারেনি। বৌ, তার নিজেরই বৌ এটা জানে তা সে কল্পনাও করেনি। বৌ-এর কাছে দরজা-সংবাদ অভ্যস্ত, এপিসোডটা তার জানা। উত্তর দেওয়ার ভঙ্গী থেকেই প্রতীয়মান। এটাই স্বাভাবিক। বৌ জানবে কী করে মিহিরের ব্যক্তিগততম অন্ধকারে জিজ্ঞাসার একটা চোরাকুঠরির সংবাদ। বৌ মানে দাম্পত্য : একটা কেজো সম্পর্ক। মিহির যদি তার বৌ-এর সঙ্গে বসে মাল খেত, নেশা করত, একদিন হয়ত মালের ঝোঁকে, গাঢ় স্বপ্নার্দ্র চোখে (মাতালের অমনটা হয়), মুণ্ড ও আঙুলের প্রচুর অকারণ দিগ্‌ভ্রষ্ট গতিবিধি, মিহির ওর বৌকে বলে ফেলত হয়ত। বৌ-ও তখন জেনে যেত (জেনে যেত কি, বলার পরেও?)। কিন্তু বৌ কি কারো বোতলের দোস্ত হয়? বৌ-রা বরং সচরাচর বোতলবিরোধী হয়ে থাকে।

উপরের প্যারাগ্রাফ তিনটে মোটামুটি ভাবে মূল কাহিনীর লিখিত অংশের প্রতিনিধি। এখানেও লেখকের সেই গোপন খেলা। মিহিরের দাম্পত্য সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা এবং ব্যবহারবিধি, তাই একটু জটিল রকমে মিহিরের মনন : মোটের উপর মিহিরের বাস্তবতা বিষয়ে দু-চারটে মন্তব্য করে নেওয়া।

একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে : মাল এবং বোতলের উল্লেখ। কাহিনীর পাঠক কি ধরে নেবে মিহিরের জীবনে এই অনুষঙ্গ খুবই জীবন্ত? মিহির হেভি মাল খায়?

(কাহিনীর পক্ষে সেটা কেলো, অকারণ গুলিয়ে যাওয়া। মিহির মাল খায় কি খায়-না এই কাহিনীর পক্ষে সেটা অপ্রয়োজনীয়। আর মিহিরের চাকরি, দোকান, ঘরোয়াপনা : মোট যে আবহ তাতে রেগুলার মাল খাওয়াটা বেশ বেমানান। পাঠককে কী করে বোঝানো যাবে যে আসবলিপ্সাটাই আসল নয়, মিহিরের দাম্পত্যের কন্টেন্টের প্রতি একটা কটাক্ষই এখানে বিবেচ্য?)

একটা দরজার অন্য পাশের প্রতি কৌতূহল, আবেগ, রহস্যবোধ, যে দরজাটা আসলে খোলা ছিল, মিহির কি একটু ছেদরে যাবে, নিজের কাছে, পাঠকের কাছে? একটু ত্রিশঙ্কু, আরো একটু বনাওটি, ফিকশনাল? একটু অবাস্তব?

সেই অবাস্তবতার ভিতরেই মিহির দরজা ঠেলে, খোলে। ঠেলার মুহূর্তে তার হাত কি থরথর করে? বাতাসে ঝমঝম শব্দ হয়? রহস্যের ভিতর উপনীত হওয়ার শব্দ?

স্টকার, পথপ্রদর্শক, হাত তুলে বাড়িটাকে দেখিয়েছিল, অজানা বাজনার উৎস, সামান্য দূরত্বে ওই বাড়িটাই তাদের গন্তব্য, বাতাসে বাজনা, গাছের পাতা নড়ে, কিন্তু সামনেই বর্তমান সেই বাড়িতে পৌঁছতে হয় বহু বহু জটিল পথ ঘুরে, একথাও স্টকারই জানাবে।

বাতাসে, গাছের নড়াচড়ায়, দিকচক্রবালের উপর সূর্যরশ্মির আলপনায় রহস্য, রহস্য ক্যামেরার শ্লথদৃষ্টিতে। ডাইনি, তুমি ডাইনি দেখেছ? ডাইনির চোখে কী থাকে? ডাইনি কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়েছিল? আলেকজান্ডার তখন ডাইনির কাছে যায়, আত্মমগ্ন অনিশ্চিত পদক্ষেপ, টেপে বাজতে থাকা জাপানি ড্রামের বাজনার রহস্য, আলেকজান্ডার আর কত হাজার বছর তুমি ডাইনির কাছে যাবে, স্যাক্রিফাইসের, আত্মত্যাগের কাছে?

রহস্য, অনেক অনেক রহস্য, ডাইনি, অন্ধকার রাখতে চায় ত্রিদিব, গোপালবাবুর ঘরে মিহিরের প্রবেশ।

প্রথম বারে, (প্রথম প্রব্রজ্যাতেই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছিলে সিদ্ধার্থ?) প্রথম বারেই মিহির ওই রহস্যের ঘরে ঢুকতে পারবে না : এরকমই পরিকল্পনা ত্রিদিবের।

অ্যারিস্টোক্র্যাসি, ডিভিনিটি, সেক্স এবং সাসপেন্স — কাহিনীর মূল ভিত্তি, শিক্ষক ক্লাসে বলেছিলেন। শিক্ষান্তে ছাত্র কাহিনী গড়ে : পরমাসুন্দরী রাজকুমারী (অ্যারিস্টোক্র্যাসি) আর্তনাদ করলেন, 'হায় পরমেশ্বর (ডিভিনিটি), আমি উদর

করে ফেলেছি (সেক্স), পরন্তু আমি জানিনা — এই উদরস্থ সন্তানের পিতা কে (সাসপেন্স)।' শিক্ষক আরো বলেছিলেন, গুণগুলির ভিতর সাসপেন্সই মহত্তম।

পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় ছিল জং-ধরে-যাওয়া পুরনো চাবিতে খুলতে-না-চাওয়া তালার জাড্য : চাবি ঘুরিয়ে চলা, মিহিরের বিরক্তি, অসহিষ্ণুতা; তালা ও চাবির দিকে ঝুঁকে-দাঁড়ানো মিহিরের কোমর টাটিয়ে যাওয়া; অধৈর্যে 'ধুস' বা 'ধুৎ শালা'। এর কোনোটাই এখন আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খসড়া মোতাবেক দরজায় তালাটাই লাগানো নয়। বারবার বাধাপ্রাপ্ত অতিদীর্ঘায়িত চাবি-ঘোরানোর পদ্ধতির ভিতর ঘটনার গতিহীনতা : মিহিরের আবাল্যবর্তমান আচরিত নিষেধের জগতের সূত্রনির্দেশ। এটা এখন আর সম্ভব নয়।

মিহির এখন একা। তার অভ্যাস, তার নিষেধভঙ্গ, তার অজানা জগতে অনুপ্রবেশের সামনে। তালা সংক্রান্ত আবিষ্কারের অভিঘাতে দমছুট মিহির কি এবার এসে বসে পড়বে টুলে, বারান্দায় রাখা গোপালবাবুর খাওয়ার আসনে? একটু জিরোবে? বৌ-কে একটু চা দিতে বলবে?

(দরজা-তালা-চাবির বিন্দুতে এত ভাটাচ্ছ কেন ত্রিদিব? ফ্রয়েডবাজি করতে চাইছ? এই করতে গিয়ে কাহিনীর গতি?)

।। তিন ।।

ত্রিদিবের অনেক লেখাই ছাপা হয়না। যা ছাপা হয় তাও কি কেউ পড়ে? ত্রিদিব তাই হাতের কাছে কাউকে পেলেই পড়ে শোনায়।

এরকমই একজন প্রথম খসড়া শুনতে শুনতে বলল, 'ত্রিদিব এত আসছে কেন? গোপালবাবু, মিহির, দিবাকর সেন তো বুঝলাম, ত্রিদিব এর ভিতর কোন বালটা ছিঁড়ছে? আগেই লিখেছিস মূল চরিত্র হওয়ার একজন দাবীদার ত্রিদিব — কেন? ওর কী ভূমিকা?'

প্রশ্নটা শুনল ত্রিদিব, বোঝে, নাকি আগেও বুঝত, তার কিছুই করার নেই। তাও, শুধুই, বারবার বারবার কেন সে ঢুকে আসতে চাইছে নিজের কাজের ভিতর?

ত্রিদিব কি আসলে নিজেকে ছুঁয়ে উঠতে চাইছে?

নিজেকে বুঝে ওঠা : এই কাহিনীতে, সব কাহিনীতেই?

তার নিজেকে ছোঁওয়ার জায়গা আজকাল ক্রমে কমে কমে যায়, শেষ হয়ে যায়? নিজেকে ছোঁওয়ার জায়গা, মিহিরের মতো? পৃথিবীকে, মানুষকে ছোঁওয়ার জায়গা, গোপালবাবুর মত? ব্রহ্মাণ্ডকে ছোঁওয়ার জায়গা, দিবাকর সেনের মত?

... নড়ে, সামনে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিন্দু সমণ্বয়, অনির্দেশ্যতায়, আসা যাওয়া করে ... তপু, তপন বিশ্বাস বসে থাকে, কিছু করার থাকে না তার ... ত্রিদিব বসে থাকে বাসে, কফি হাউসে ... বেশ্যাবাড়ির অল্প-আলোকিত ঘরে, সামনের দেওয়ালে বেশ্যাটির সন্তানের ছবি লটকানো থাকে, যে সন্তানকে সে নিজের কাছে এনে রাখতে পারে না, থাকে কালী ও রামকৃষ্ণ ... ছাব্বিশ টাকার ব্ল্যাক লেবেল পঁয়ত্রিশ টাকায় চুমুক দেয় ত্রিদিব ... মিনতি বিষণ্ণ থাকে, তার কালো ও গরিব ও ঘামদুর্গন্ধ শরীর ত্রিদিবকে কিছুতেই খাড়া করতে পারে না ... নড়ে, সামনে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিন্দু সমণ্বয়, অনির্দেশ্যতায়, আসা যাওয়া করে ...

... তপু নড়ে, ওঠে ... অন্ধকারের কাছে গিয়েছিল ... অন্ধকারের আশ্রয়, ব্রহ্মাণ্ড ... ত্রিদিব হাত নাড়ে, পা, ফিটাল নড়াচড়া ... এ মোর জননীর গর্ভের আঁধার, অন্ধকার পরিপূর্ণ দশদিক, পরিপূর্ণ অন্ধকারের শূন্যতা, অন্ধকারই পূর্ণ ও শূন্য ... পূর্ণমদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ... অন্ধকার, অন্তহীন প্রব্রজ্যা, নড়ে চলা, ফিটাস ...

মিহিরকে, গোপালবাবুকে ভেবে নেওয়ার উপাদান কি ত্রিদিবের নিজের ভিতরই থাকে? ত্রিদিবের ভাবনায়, চিন্তাতে?

এই পরিকল্পনার উপাদান যখন তৈরি হয় ত্রিদিবের মাথায় (মাথায় না অ্যালকোহলায়িত পাকস্থলীতে?) তখন ত্রিদিব একা। কেয়া আর তার সঙ্গে নেই। প্রায় ছ-বছর একত্রবাসের স্মৃতি, কিছু উপজাত অভ্যাসের বদলে-ফেলা জনিত বিপন্নতা। সম্পর্ক। গড়ে উঠেছিল চার বছর দাম্পত্য যোগ প্রাকদাম্পত্য দুই। প্রাকদাম্পত্য, যখন তাদের দেখা হত সপ্তাহে সাত, মাসে ত্রিশ একত্রিশ, লিপ ইয়ারে তিনশো ছেষট্টি দিন।

গভীর রাতে আজকাল ফেরে ত্রিদিব। ধর্মতলার কোনো মালের ঠেক থেকে। লবণ হ্রদের সেই নির্মানুষ, যথাসম্ভব ঋজুরেখ রাস্তা। কোনো গাছের গোড়াতেই রাতটা থেকে যাওয়ার প্রবল বাসনা জন্মায়। (রাতের আশ্রয় : কোনো হ্যালোজেন পোস্ট নয়, কোনো গাছ? কেন? প্রাগইতিহাস অভ্যাসের অনুবর্তন?

নির্মানুষ ঋজুরেখ হ্যালোজেন রাস্তা : থেমে যেতে চাওয়া।

অথচ গতি ছিল। ছিল কোনো এক দিন। কেয়ার কাছে পৌঁছনোর গতি। কেয়ার জন্য কোনো কষ্ট হয় না ত্রিদিবের। সেই গতিটা। গতি : ত্রিদিব হারিয়ে ফেলেছে।

ত্রিদিবের এক বন্ধু, বন্ধু ওর অনেক, অনেকের সঙ্গে বসেই মাল খায় ত্রিদিব, কদিন আগে ওকে নিয়ে যাবে নিজের ফ্ল্যাটে। বন্ধুর স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, দুশো পঞ্চাশ দিন, ফ্ল্যাটের চৌখুপি বাতাসে গাওয়া ঘিতে লিসিয়া ম্যাকারোনি ভাজার আতত গন্ধের আনন্তিকতা। তেজপাতা আর ছোট এলাচ। ঘাই রমণী নেসলের এভরিডে হোয়াইটনার গুলে দুধ বানায়, নিজের জন্য পায়েস রাঁধে। অনেকান্নবর্তী পারমানবিক পরিবারে যেমন হয়, নিজেরটা নিজেই, প্রসব ও পারলৌকিকতা।

রমণী সোফায় বসে। সামনের টুলে পা। 'পা একটু ঝুলিয়ে রাখলেই না খুব ফুলে যাচ্ছে।' মৃদু লাজুক হাসি। সন্তানধারণের গর্ব। মেলামাইনের অফ হোয়াইটে চকোলেট রঙ ফুলের ক্রিম রঙের পাঁপড়ি, আনব্রেকেবল বাটি, পায়েস, 'আমি খেয়ে নিচ্ছি বাবা', পায়েস, মানুষের খাদ্যগ্রহণেও কত তৃপ্তি থাকে। ত্রিদিবের পাঁজরে পাঁজরে একটা আটকে-যাওয়া নিশ্বাস ঘোরে, ঘুরছিল, কামড়।

একটু পৃথুলা হয়ে-ওঠা, ঘরে পরা রাতজামার ফোলা ফোলা ভাঁজ পৃথুলাতর করে, মেরুদণ্ড থেকে প্রায় দেড়ফুট প্রাগ্রসর পেট, নারীটি ব্যতিব্যস্ত থাকে, নারীটির গর্বিত অসহায়তা ত্রিদিবকে পরিতৃপ্তি দেয়, নারীটিকে দু-হাতের ভিতর পাঁজাকোলা করে তুলে নিতে চায় ত্রিদিব, তারপর জ্যোৎস্না, জল জঙ্গল আর পাহাড়, দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রতিটি পার্সপেক্টিভে চাঁদের আলোর প্রতিভাসে নরম আউটলাইন। বাচ্চার, গর্ভবতী মায়ের, রোমান্সের এবং স্বপ্নের ছবিতে যেমন সফনিং ফিল্টার ক্যামেরার লেন্সের সামনে : আলোর গতিপথ মৃদু এলোমেলো, নরম, স্নিগ্ধ।

নারীটিকে ত্রিদিব পরিচর্যা করে। চাঁদ জল জঙ্গল ও সফনিং ফিল্টার। ইহা স্নিগ্ধতা হয়। স্বপ্ন।

ত্রিদিবের বাসনা হয় যে আর কোনোদিন মাল খাবে না সে, ফলতঃ হ্যাংওভার হবে না, মাথা ভার হবে না, অ্যাসপিরিন আর কড়া কালো কফি খেয়ে হ্যাংওভার কাটাতে হবে না। সে শুধু পরিচর্যায়। দিনের পর দিন, রাত, মাস, বছর নারীটিকে সে পরিচর্যা করে চলে। পায়েস রান্না করে খাওয়ায়। পায়েস কেন, মালপোয়া, গোকুলপিঠে, মুগের ডালের পুলি। সেই সমস্ত রেসিপি সে খুঁজে, অন্বেষণ করে, গবেষণা করে নিয়ে এল পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, মালদার সমস্ত প্রত্যান্তিক নির্বিদ্যুৎ গ্রাম থেকে। সারা সকাল, দুপুর তেল মাখিয়ে নারীটিকে মসৃণ করে তুলল, অল্প করে খোলা শাওয়ারের নরম ধারায় স্নান করিয়ে দিল। পরিচর্যার কোনো ত্রুটি না হয়। ও একটা যাদুকে বহন করছে। লিভার, স্প্লিন, গল ব্লাডার, ইনটেস্টাইন, প্রাত্যহিক পরিচিত উদর, তার ভিতর একটা মায়ার জন্ম হয়। একটা রহস্য। অজানা।

গোপালবাবুর ঘর। মিহিরের প্রাত্যহিকতা।

সত্যিই কি করত ত্রিদিব — ওই পরিচর্যা? কেয়া যদি গর্ভবতী হত? জানেনা ত্রিদিব। কেয়াকেও কি ওইরকম ছেলেমানুষ, ভঙ্গুর আর গভীর দেখাত? গর্ভবতী? কেয়া কি হবে আর কোনোদিন অন্তঃস্বত্ত্বা? একবার একটা ভাঙা সম্পর্কের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কেয়া, ন্যাড়া ক-বার বেলতলায় যায়?

নেতারহাট থেকে মহুয়াডার, বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্টের প্রত্নসংগ্রহের বাসে, কনজেস্টিভ ডিসমেনোরিয়া-কাতর কেয়া, সেই কোন সকালে খালি পেটে 'পঞ্চায়েত ক্যান্টিন' হোটেলের এলাচ লবঙ্গ আর প্রচুর দুধে খয়েরি-হলুদ চা, ত্রিদিবের কাধে মাথা, মাথাটা এগিয়ে আনল, নড়বড়ে, ত্রিদিবের কাঁধে বমি করে দিয়েছিল। তার জন্য কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ হয়নি কেয়ার, দুঃখ পেয়েছিল।

কেয়া যদি কোনোদিন অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ও আর, ত্রিদিব জানবেনা।

কেন হয়? সেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় যার ভিতর মানুষ মানুষী তীব্র অবিরল গতি পেতে থাকে, বুদ্বুদ স্বপ্রভ মুক্তো বেয়ে বেয়ে, মদের বহুযোজন তরল আমন্ত্রণী শরীর ঠেলে, মিশরের মানুষী ওই মুক্তো আমার মদের গেলাসে রেখেছিল।

ত্রিদিব জানতে পারেনি, একদিন জলার মাটিতে আলেয়া বেরিয়ে আসে, দুঃস্বপ্ন, শরীরের অভ্যস্ত প্রেক্ষিত ফুঁড়ে রূপকথা জন্মায়। রূপকথা না রূপকথার মৃত্যু, মহাপরিনির্বাণ? মৃত্যু যা রূপকথাকে চিনিয়েছে, বাস্তব করেছিল?

রূপকথা যা বাস্তবতা ছিল, প্রাত্যহিক, শেষ সত্য বলে মনে হয়েছিল। রাতে খেয়ে উঠে দুজনে গভীর রাত অব্দি আড্ডা, রাতের নিস্তব্ধতার বাতাসে মায়া, কাঁচের জানলার অনেকটা অ্যাসফল্ট রাস্তায় ঘোড়ারা, প্রায়ই যায়, কোথা থেকে আসে, এই সল্টলেকে, মহীনের?

সুখ।

সুখ একটা আবহ। স্বপ্ন। স্বপ্ন, কিছু ছবি : শব্দ। বিশেষ কিছু শব্দ। আমি সুখ লিখি, এখন আমি কিছু শব্দ লিখছি এবং কিছু শব্দ লিখছি না। শব্দের পারস্পরিকতা।

অন্তর্জলী যাত্রায় গেল সীতারাম। সীতারাম অতি প্রাচীন ... নিস্পলক চক্ষুদ্বয় মহাকাশে নিবদ্ধ, স্থির ... গঙ্গার জলছলাৎ তাহার বিশীর্ণ পদদ্বয়ে লাগিতেছিল ... অন্তবন্ত, অন্তরঙ্গ এ দেহ ... । সীতারামের অতিবৃদ্ধ দেহের ('অব্যক্তের লীলাসহচরী মাতা, কোন মাতা এ দেহ হইতে বারেক সৃষ্টির বীজ সঞ্চয় করিয়া আপনার সঙ্গোপনে রাখিবেন কে জানে!') অশারীরিকতার, দন্তহীন মাড়ির বীভৎসার প্রতিতুলনা 'শিশুর কপোলস্পর্ষ জনিত যে রেশমি অনুভব'। শিশুর কপোল, রেশমের বিলাস। 'শিশু', 'কপোল', 'রেশম' এই শব্দ। বাস্তব শিশু, তার কপোল, রেশম : এদের কোনো তাৎপর্যই নেই। 'শিশু' 'কপোল' 'রেশম' শব্দের বিশিষ্ট সমাহারে চিহ্নীকৃত অনুভূতির তাৎপর্য।

কেন এই বিশেষ উপমাটিকে বাছা হল? এই বিশেষ সমাহার? কেন?

অন্য যে অজস্র শব্দ, তাদের সমাহার (উদাঃ সারমেয়, বিষ্ঠা, গনতন্ত্র) বাইরে রইল, অনন্ত সংখ্যক, তাদের অনুপস্থিতিই তাৎপর্যকে চিহ্নিত করল।

ত্রিদিব, সুখ, কেয়া। কিছু শব্দের উপস্থিতি। অন্য শব্দের, শব্দ সমাহারের অনুপস্থিতি। ত্রিদিব, কেয়া সুখে ছিল। সম্পর্কে, দাম্পত্যে। দুজনের পরস্পর বোঝাপড়া। দুজনের সম্মিলিত বাস্তবতা। রাতের আড্ডা, নিস্তব্ধতা, পর্দায় হাওয়া খেলা করে, মায়া ছড়াত। তারা নিস্তব্ধতা বলে ভাবত।

ভাবা মানেই শব্দ। শব্দ ইতিহাস থেকে জন্মায়। ব্যক্তির বিশ্বে শব্দ একটি প্রদত্ত প্রবহমানতা। ব্যক্তির বিশ্বে শব্দের প্রত্যক্ষতা নেই। শব্দ সামাজিক। শব্দ কিম্বদন্তী। রূপকথা।

শব্দের জগতের পরে নৈঃশব্দ্য : তমসার জগত : বাস্তবতা।

বাস্তবতায় ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই বোধ নেই। দিন, রাত, দিন; দিনের পর দিন যায় : এমন একটা দিনের দরজায় এসে পৌঁছয় ত্রিদিব, যখন সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কেয়াকে সে কোনোদিনই চেনেনি : খুঁজে পাবে ত্রিদিব। কিছু বুঝে উঠতে না-পারা, এই অন্ধকার, তমসা, ফিটাল, এ মোর জননীর গর্ভের আঁধার, এখানে কোনো রূপকথা নেই, শব্দ নেই।

ঘোড়া, কুকুর, মাতৃজঠরে শিশুর অসহায়তা প্রত্যক্ষ, শব্দহীন।

সেই অসহায়তা, অন্ধকার : ব্যক্তিক। কিম্বদন্তী নয়। প্রত্যক্ষ।

অন্ধকারই চূড়ান্ত।

ত্রিদিবের বারবার আত্মঘোষণার অক্ষমতা কি জন্মায় এই অধুনার দেহ থেকে, ব্যক্তির ইতিহাস যেখানে হারিয়ে যেতে থাকে? হারিয়ে যায় এককের জগতে বোধের, ইতিহাসের অনুবর্তনের গতিবিজ্ঞান?

হারিয়ে যাওয়া কি শুধুই এককের বিশ্বে, মহাপৃথিবীতে নয়?

যে এলাকায় মিহিরের বসবাস, তপন বিশ্বাসেরও, যে এলাকার প্রতিভাস প্রত্যক্ষে না-এনেও কাহিনীতে পরিস্ফুট করে তোলার পরিকল্পনা ত্রিদিবের, সেই রকম একটা এলাকাতেই সে থাকত, কৈশোরে, তরুণ বয়সে, প্রথম যৌবনে।

সেখানে কয়েকটা বাড়ি পরে পরেই একটা করে পুকুর। পুকুর : নিকটবর্তী অস্তিত্বের অন্তঃস্থল অব্দি চারিয়ে যাওয়া জল।

পুকুর। কলমিদাম আর শাপলা, মাঝে মাঝে কচুরিপানার সংক্রমণ, আরো কম মাঝে মাঝে তার সমাজসেবামূলক অপসারণ, গ্রীষ্মের দুপুরের জলের, শ্যাওলার গন্ধ বাতাস বেয়ে বেয়ে চারদিকে, ধীরে, মৌসুমি বৃষ্টিকলরোলে ছোট ছোট ঘোলা জলধারা, জলের শরীরে নিয়ত রঙের খেলা; মানুষ-নিরপেক্ষ, গড়ে, ওঠে, ভাঙে, গড়ে, ওঠে। শরীরের কাছে এই পুকুরের উপস্থিতি : নিকটবর্তী নারীরা চর্যাপদের, সান্ধ্যভাষার, সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের, রহস্যের হয়ে ওঠে। বাতাসে, মাটিতে, দৃষ্টিতে জল, জল, জল নারীকে প্রেমিক করে, পুরুষকে প্রেমিক করে। প্রেম : স্নেহ : অপত্য; মাত্রা ভেঙে যায়।

পুকুরের পাড়ে, বাড়ির দরজার তিরিশ কি পঁচিশ ফুট দূরে, শরীর কাত থাকে, মাথা প্রায় আনুভূমিক, ত্রিদিব আকাশ দেখত। তারার আলো মিটমিট করে, তারার দিকে তাকিও না, তাও তারা দেখত ত্রিদিব। কৈশোর। একদিকে ফ্রক আর আঁচল। অন্যদিকে এরিক ভন দানিকেন। (ফন নাকি ভন এই অনিশ্চয়তা, পীড়া : কৈশোর।)

চ্যারিয়টস অফ দি গডস। গ্রহ থেকে গ্রহান্তর। প্রত্নবিমানাবতরণক্ষেত্র। পুতুলে খেলনায় গ্রহান্তরের রূপারোপ। গ্রহের মধ্যে গ্রহ, অন্য গ্রহ, গ্রহান্তর। পৃথিবীটা তখন কি টানটান। উত্তেজিত দীপ্ততায় সদালোকিত।

তারার দিকে তাকিয়ে-থাকা, একদৃষ্টে, আরো বেশি, আরো আরো বেশি দেখার চেষ্টা সেই অনড় আকাশছবিতেই; দানিকেন থেকে আর্থার ক্লার্ক, রে ব্রাডবেরি, ভ্যালেন্টিনা ঝুরাভলিওভা, কারোর না কারোর মুখ থেকে জেনে-ফেলা ক্রমপ্রসারশীল মহাবিশ্ব, রেড শিফ্ট, আর কোথাও প্রাণ আছে না নেই, কালো গহ্বর, বিপরীতমুখী সময়, সময়ের বিপরীত বলতে কী বোঝায়, সূর্য কুঁকড়ে যাচ্ছে, সূর্যের মৃত্যু আছে, অন্য আরো অনেক তারার মত, সূর্য একদিন নিভে যাবে, সূর্যের সঙ্গে সৌরজগত, পৃথিবী, আমরা; আমি, আমার দেহ, চারপাশ, পৃথিবী, সৌরজগত, নক্ষত্রমণ্ডল, গ্যালাক্সি, মিল্কি ওয়ে, ব্রহ্মাণ্ড : কত বড়, কী সেটার আকার, নিজেকে ভঙ্গুর আর ছোট, আতঙ্ক জন্মাত ত্রিদিবের মাথায়। নিজেকে না-খুঁজে পাওয়ার আতঙ্ক।

আতঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করত ত্রিদিব। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনবে, চারদিকে আম জাম কাঁঠাল আর পেয়ারা গাছ, গাছের পাতায় পাতায় এলোমেলো আকাশরেখা, কোথাও তাকে ভেঙে ঋজু অপ্রাকৃতিকতা : মানুষের তৈরি ঘর বাড়ি দালান, রাতের আকাশের তারার আভা তাদের ঋজুতাকে ওয়াশে আঁকা জলরঙের সোজা দাগের মত করেছিল : নরম কোমল মেঘমেঘ, ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেমন, বা স্বপ্নে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে।

নিজের ভিতর আতঙ্ক, ছটফটানি, অস্থিরতা, নিশ্বাস ঘন হয়ে আসা, দুই চার ফুট দূরেই জৈবনিক কালো নরম কাদায় ব্যাঙের ব্যারিটোন কর্কশতায় মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করত ত্রিদিব। সেই ডাকটাও কি স্বাদু, উষ্ণ। নাকের কাছে দূর্বাঘাসের ডগার ভেজা ভারি সবুজ গন্ধ, তাতেও যদি অস্থিরতা না-কাটল, উঠে ঘরে যেত ত্রিদিব।

ঘন বাদামি প্রেক্ষিত, হালকা হলদেটে বাদামি, হালকা সবুজ চকরাবকরা, পালিশ করা কাঠের পাটাতনে কাঠের আঁশের নিজস্ব অলঙ্করণ, উদ্ভিজ্জ ঢেউ, তেলতেলে সেগুন প্লাই ঢাকা লম্বা ডিমেল গড়নের টেবিলে প্লাস্টিকের ম্যাট, সস্তা প্লাস্টিকের উচ্চকিত রঙ, ঢেকে রাখা স্টেনলেস স্টিলের পাত্রে খাবার : খেয়ে চলার নিঃশব্দ, নির্মম, নির্জন যান্ত্রিকতা। মহাবিশ্বকে চিনে উঠতে না-পারার আতঙ্ক মিলিয়ে যেত, ক্রমে।

অনেকটা অংশ, এই খসড়ায় লেখা গেল, নতুন খসড়া করা মানেই যেন আগের খসড়া থেকে টুকে দেওয়া, কী আরাম, প্রায় কিছু বদলাতেই হল না।

এর পর অনেকটা জায়গা জুড়ে, প্রথম খসড়ায়, প্রায় হাজার দেড়েক শব্দ, ত্রিদিব তার নিজের কথা লিখেই গেছে, লিখেই গেছে, পৃথিবীর কথা, মহাপৃথিবীর, যা তার নিজের। সেই মুহূর্তের নিজের, যখন সে প্রথম খসড়াটা লিখছে।

তার শুরুটা এইরকম, কিন্তু বিশ্বপৃথিবীকে বুঝে উঠতে না-পারার তার এখনকার অনিশ্চয়তা, সেটা কিছুতেই মিলিয়ে যায় না, কেন, তার বয়স বেড়ে গেছে?

তার পরের প্রসঙ্গই ইরাক যুদ্ধ। পৃথিবীর দুটো ভগবানের দ্বিতীয়টা, রাশিয়া, উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ। সারা পৃথিবী লাতিন আমেরিকা হয়ে গেল, যাচ্ছে, গিয়েছে। 'মিসিং'। এক স্টেডিয়াম মানুষ। খুন হয়ে গেল একের পর এক।

প্রাত্যহিক, নিয়ত, অবিমিশ্র খুন। আমেরিকান বুট, ছিবড়ে হয়ে যাওয়া লাতিন আমেরিকা, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া প্রচুরতর মার্কিন ডলার। মার্কিন পুলিশ, কালো রক্তের ধর্ষণ, ট্রেসি চ্যাপম্যান : 'সাবসিটি', 'সুইসাইড — দি লাইন ডিভাইডিং দি হোয়াইটস ফ্রম দি ব্ল্যাকস', এবং 'লাস্ট নাইট আই হার্ড দি স্ক্রিমিং'। আর ভারতবর্ষে, দুশো বছরের সাদা চামড়ার শাসনের পর ভারতীয় রেলের 'প্যালেস অন হুইলস' : আপনাকে ব্রিটিশ রাজের বিলাসিতা মনে পড়াবে। কলকাতায় জোব চার্নকের, ইংরেজ পদপাতের (পড়ুন, পদাঘাতের) তিনশো বছরের জয়ন্তী উৎসবে মন্ত্রীর বাচ্চাদের ঘোড়ায় টানা ট্রামের বাবুবিলাস। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আলো-শব্দের চলৎছবি : ব্রিটিশ রাজপুত্র উদ্বোধন করলেন। পৃথিবীতে শুধু একটা ধারাবাহিকতা, সাদা চামড়ার ধারাবাহিকতা। অন্য পৃথিবী, অন্য ব্রহ্মাণ্ডগুলো কোথায়? বিপরীত সময়ের কালো গহ্বরে, ব্ল্যাক হোলে? ইতিহাসের পিছু হটা, বিপরীতায়ন, সময়ের উল্টোমুখ, রাশিয়ার সত্তর, ভারতের দুশো, শুকনো পাঁপড়িগুলো ধুলো থেকে উড়ে উড়ে ফুলের বৃন্তে, শিশিরসিক্ত তাজা ফুল?

লিখেছিল এরকম, ত্রিদিব, প্রথম খসড়ায়, এখন ভুল মনে হবে। মর্গে এসে হৃদয় জুড়োবে। বিপরীত, ইনভার্শ, ইনভার্শন। ইনভার্শনে অস্তিত্ব অনস্তিত্ব হয় না। এখন সত্য ক্রমে অনস্তিত্ব হয়। সত্য বলে কিছু নেই, থাকে না, ছিল না।

সত্য মানে পার্টিজান সত্য। কোনো না কোনো এক পক্ষে।

'কী খোকা, রাশিয়ার মানুষের উপর কমুনিস্ট পার্টি অত্যাচার করেছিল?'

'হে হে, দেখো — বাচ্চাটা ক্যাপিটালিস্ট।'

বাচ্চা, তুমি যদি বিপরীত উত্তর দাও, তাহলে তুমি কমুনিস্ট।

যে উত্তরই দাও তুমি, উত্তর বা দক্ষিণ, হয় তুমি দক্ষিণে নয় বামে — তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে, সাধনের জন্য তুমি ঘুরঘুর করছ — চকোলেট নেবে খোকা?

ইতিমধ্যে পিতারা ও পতিরা, জাতির পিতা ও সমাজপতিরা, অনেক সংহত। তারা জানে রেডটা আগে ফেলে দিতে নেই। রেডটাই নড়বে, চড়বে, সাদার স্বপ্ন তৈরি করবে, কালোর স্বপ্ন, ক্যারম খেলা চলতেই থাকবে।

তোমার বাস্তবতায় তুমি (পিতা/পতি) গোদাবরীর উত্তরতীরে পিপলস-ওয়ার রাখলে, দক্ষিণে আবার অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরু ... — অর্দ্ধ বা অনর্দ্ধ সামন্ততন্ত্র — সেটা কী বস্তু, নচিকেতা, অমরত্ব দেয়? নাকি, সফল সঙ্গীতের ক্যাসেট? তোমার টেলিভিশনে তুমি গরিব মানুষের জীবনচরিত দেখালে, শুকনো মায়ের শুকনো স্তন, তাতে মরে শুকিয়ে লেগে ঝুলছে শুকনো টিকটিকি শিশু। চ্যানেল ওল্টালাম, বা বসে রইলাম টেলিভিশনের সামনে, তুমি অপর্ণা সেন বা মাধুরী দীক্ষিতের ওই একই জিনিষ দেখালে, মাই-রি বলছি, এক তিলও শুকনো নয়। সবই রইল, বাস্তবতা : টেলিভিশনের ছবি।

মাঝে মাঝে লড়াইকে তুমি তুলে আনো, মিডিয়াহীন, এক্সপোজার-রিক্ত, অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে। পুরষ্কার দাও। প্রজারা দেখে রাজা কী মহিমাময়, দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, ত্রুটির সংস্কারে এবং যোগ্যের পুরষ্কারে। বজ্রকঠোর কুলিশধারী রাজার অন্য হাতে বরাভয়, কুসুমকোমল। রাজার মহিমায় প্রজা গান গায়। শুধু প্রজার ভীত নিস্তব্ধতা নয়, তার বুকের গানও তুমি বার করে আনতে পারো।

লড়াই-ও তোমার শরীরের অন্তর্গত হয়ে পড়ে।

কী বিরাট রাজা — আসমুদ্রহিমাচল।

তোমার কারখানা জলে বিষ মেশায়। তোমারই গ্রিন-পার্টি প্রতিবাদে। তোমারই মিডিয়ায় লড়াকু প্রতিবেদন। তুমি তাকে কত কিছু দিলে — সেই প্রতিবেদককে — বিদেশভ্রমণ, সেমিনার, সাদা চামড়া নারীর পাশে বসল একই রকম চেয়ারে।

তোমার খারাপ কারখানা-মালিক, তোমার মহিমাকে কলঙ্কিত করতে চায়, শাসিত হল, তোমার মহিমাকে বাড়িয়ে তুলল : প্রজারা জয়গান গায়।

তোমার সমস্ত বাহিরকে তুমি অন্দর করে ফেললে।

এর পর কোনো শম্বূক যদি বেদপাঠ করতে চায়, তোমার আক্রমণ করার দরকার নেই। তুমি জানো, শম্বূকের আত্মীয়রা, তোমার প্রজারাই তাকে আক্রমণ করবে। 'শুনেছেন দাদা, শম্বূক শিশুদের সাথে, কী বলব আর, যৌনক্রীড়া করে — ওই যে কী বলে যেন — পিডোফিলিয়া — কী সব পারভারশন বলুন তো।'

তখন কোনো বিদ্রোহ নেই, কোনো সত্য নেই। কারণ, কোনো লড়াই নেই। লড়াই মানে ভজনা, শত্রুরূপে। দাস সর্দার রাজা হল, রাজা দাস, আমরা কোট বদলাচ্ছি।

তখন কোনো সত্য নেই, কোনো অর্থ নেই, কোনো বাস্তবতা নেই। বাস্তবতা হয় পণ্য। পণ্য যা সকল বস্তু ও ক্রিয়া, দ্রব্য ও সেবা। কোনো প্রাচীন কালে পণ্য ছিল প্রাকৃতিক। প্রকৃতি যোগ মানুষ সমান পণ্য। প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক মানুষের শ্রম পণ্য বানাত। পণ্য মানেই পণ্যের ব্যবহার। পণ্য তখন ব্যবহারমূল্য।

তারপর বাজার আসবে। পণ্য তখন বিনিময়, সমাজের অস্তিত্ব, সামাজিকতার প্রবাহ : বিনিময়। পণ্য তখন সামাজিক। বিনিময়মূল্য।

তার পর অন্তর ও বাহির এক হয়। বহিরঙ্গই পণ্য। বহিরঙ্গ বদলায় মানে পণ্য বদলায়। সানসিল্ক থেকে নিউ প্রোটিন-এনরিচড সানসিল্ক। সুদৃশ্য প্যাকেট। সুদৃশ্যতর। গুডনাইট সে ভি বেহেতর, মজনু সে ভি দিওয়ানা, গুডনাইট সুপারপাওয়ার। প্যাকেট কত সুন্দর সেটাও চলে আসছে পণ্যের গুণপনার তালিকায়। পণ্য তখন শুধু একটা চিহ্ন। আমরা চিহ্নমানুষেরা চিহ্নবৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় নড়াচড়া করছি : চিহ্নের চলন বিচলন। মিহির আর তামাকু সেবনের অপকারিতায় ভোগে না, অপকারিতা একটি চিহ্নের, লালের উপর সরু নীল দাগ প্যাকেট : নাম চার্মিনার স্পেশাল। আমি আমার ভিন্নতর পত্নীপ্রেমকে চিহ্নিত করতে পারলাম 'উডল্যান্ডস' চিহ্ন-সম্পন্ন প্রসব চিকিৎসায়, তুমি শালা 'মেডিকাল কলেজ' চিহ্ন বহন করো। বাস্তবতা চিহ্নবৈজ্ঞানিক। পণ্য তখন চিহ্ন।

তারপর আর আলাদা করার কিছু নেই। রাইগর মবিলিস। সাইকেল আরোহী হিমমণ্ডলের শীতল-মসৃণ বরফের উপর সাইকেল চালায়। ঠান্ডায় সে মরে গেছে অনেকক্ষণ হল : মৃত, শক্ত, মৃত্যুদৃঢ় কঠিন। তার পা উরু হাঁটু শরীর সাইকেল চালায়, তাই সে সাইকেল চালায়। মৃত্যুর খাঁচায় বন্দী তার গতিময়তা, অবিচল, অপরিবর্তনীয়। শুধু গতিকে ধারণই করে না, সে ত্বরণও অর্জন করে, মৃত্যু-উত্তর, বর্তমান-উত্তর, আধুনিক-উত্তর প্রব্রজ্যা, রাইগর মবিলিস, নিরন্তর সাইকেল চালিয়ে চলে।

পণ্য তখন পণ্যত্ব-ধর্মের চারিয়ে-যাওয়া, চারিয়ে যেতে-থাকা। পণ্য তখন ফ্র্যাক্টাল। ফ্র্যাক্টাল জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, গাছের জ্যামিতিক গতিময়তা খুঁজে পাই, জ্যামিতিক সমগ্রতাকে, গাছের ক্ষুদ্রতম এককে, পাতায়। পাতাই গাছ। পণ্য কোনো প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির নয়। পণ্যপ্রাপ্তি নামক পরিতৃপ্তি-পণ্যের ক্ষুদ্রতম এক ক একটি পণ্য। প্রতিটি পণ্যই সেই পণ্যত্বধর্মের প্রতিনিধি, অর্থাৎ, সমগ্র পণ্যবাস্তবতা।

যেখানে কোনো বোঝা নেই, কোনো না-বোঝা নেই। বোধ একটি ব্যাকরণ, পণ্য-সমগ্রতার ব্যাকরণ।

কোনো ধারণা, কোনো বোধ, কোনো সত্য নেই।

একটি ছোট আয়না, গোপালবাবুর ঘরে যেমন থাকার কথা, যে কোনো আয়নাই তখন ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড মানে শুধু আয়নার সীমাবদ্ধতায় চিহ্নীকৃত কিছু দ্বিমাত্রিক চিহ্নের পারস্পরিকতার আরো আরো আরো আরো চারিয়ে যাওয়া। যে কোনো কিছুই এখন সবকিছু।

কোনো কিছুই আর কোনো কিছু নয়।

।। চার ।।

গোপালবাবুর ঘরের দরজা ঠেলে, ঢোকে মিহির। কিছুক্ষণ যাবৎ আলোআঁধারির একটা ধোঁয়াশা, ঘরের দুটো জানলাই বন্ধ ছিল। ঘরের ভিতরের অন্ধকারে চোখ সয়ে আসবে, জানলাদুটো, তাদের বন্ধ কাঠের পাটাতন এখন স্পষ্ট।

মিহির কি একটু অবাক হবে? সে জানত না এই ঘরে জানলার সংখ্যা দুই? মিহিরের মনে হয়, এটা তার না-জানার কথা নয়। বাড়ির পিছনদিকে চারটে জানলা, পর পর, মোটামুটি সমান দূরত্বে। একটা রান্নাঘরে। মাঝের ঘরটায়, মিহিররা থাকে, দুটো। বাকি এক, সেটা এই ঘরে। এ ঘরের অন্য জানলাটা পাশের দেওয়ালে, রোজই দেখেছে,

একবার দুবার, বাথরুম পায়খানা যাওয়ার পথে। তাকাত কি মিহির, সচেতনে? না-তাকালেও চোখে আসে, নিত্যকার জিনিষপত্র যেমন হয়।

এই বাড়ির, রোজকার এই চেনা বাড়ির, এই বাড়িরই পিছনদিকটা ঠিক কেমন দেখতে, মিহির কি মনে করতে পারে? ছোটবেলায় যেত খুব, চোর-পুলিশ খেলতে, কারণে, অকারণে। কী আর শুধু কারণে হয় : ছোটবেলায়?

বড় হওয়ার পর, একবার চুনকামের সময়, আর একবার মমতার বিয়ের দিন এঁটো কলাপাতা ফেলার গর্তটা কোথায় করবে, সেটা গিয়ে জন-খাটার লোকটিকে দেখিয়ে দিল মিহির, এছাড়া আর কখনো গেছে কি সে পিছনদিকটায়?

এতৎসত্ত্বেও সে জানত, বাড়ির পিছনদিকে জানলার সংখ্যা চার। ঘরে ঢোকার প্রাথমিক মুহূর্তে তার মনে এল না।

জানলাদুটো খুলে দেবে? — না, থাক।

একটু দ্বিধা। চারপাঁচটা বাক্য সেই দ্বিধার বর্ণনায়। দ্বিধা : অনুপস্থিত মানুষের ঘর খুলে ঢোকার অপরাধবোধ এবং ভয়। জানলাদুটো খুলে দিলেই বাস্তবতার শরীরে একটা প্রমাণ, তার এই অনুপ্রবেশে। কোনো মানুষের চোখে পড়ে যাবে এই খোলা জানলাটা। বলে দেবে কি গোপালবাবুকে, অনুপস্থিতিকালীন তার ঘরের জানলা খোলা ছিল?

জানলাদুটো খুলে দেবে, না কি বন্ধ থাক? তাহলে আলো, সুইচদুটো কোন দিকে, চোখেও পড়ে না ছাই, চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে আসার অপেক্ষা করে মিহির।

ইত্যাদি সব ঘটনাক্রম, ছোটখাট টুকরো-টাকরা, যেন বাস্তব, যেরকম ঘটেই থাকে, পাঠকের মাথায় : হাতের আঙুলে স্পর্যনীয় বাস্তবকে জাগিয়ে তোলা, ঢুকে আসছে কাহিনীতে। এগুলোর সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে পাঠকের কল্পনায়, উপন্যাসের ক্রেতার কল্পনায়, ঘটনার গতি কমে যায়। একটা ব্যালান্স চাই, ব্যালান্স।

এই অংশটার পরিকল্পনা লিখছে, ত্রিদিব উত্তেজিত হয়ে পড়ে, একটা স্বপ্নের সিকোয়েন্স। একটা কাহিনী, একটা উপন্যাস মানে তো গ্র্যাটিস, প্যাডিং। কয়েকটা বিন্দু মাথায় উদয় হল, স্বপ্নে দেখেছি, হঠাৎ পেয়ে গেলাম, টুকরো-টাকরা থিম, বিষয়, কতদিন হল খুঁজছি, এরকম কয়েকটা মাত্র বিন্দু, মাত্র, আর তাদের মধ্যের ফাঁকগুলো ভরাট করে চলো, ভরাট করে চলো, ভরাট করে চলো। বাক্যগুলো ঝুলে যাচ্ছে, বদলা, বাঞ্চোত। ভরাট করে চলো। পর পর দুটো বাক্য শেষ হল একই আকৃতির সমাপিকা ক্রিয়ায়, বদলাও, বদলাও। লেখাটার ঝাঁঝ মরে যাচ্ছে : চোখদুটো বড় করে খোলো, নাকের পাটা ফোলাও, কানে লাগানো ওয়াকম্যানে 'রোজা'-র ক্যাসেটটা বেশ ঝিনচাক, ভলুম বাড়াও, কানের উপর ভেঙে পড়ছে সমাজতন্ত্র, ভারত সরকার, কুমারীর হাইমেন। নিজেকে ঘোরের মধ্যে নিয়ে চলো, আত্মসম্মোহন, সব অপমান সমস্ত লাথি যা তুমি পেয়েছ নিজের ভিতর জাগিয়ে তোলো, ভরাট করে চলো। একটা লেখার বেশিটাই শূন্যতা, ভরাট করে তুলছি, তুলছি কেন? শূন্যতা তো ভরাট করে উঠতে পারিনা, কোনো শূন্যতাই : জীবনে, সম্পর্কে, সাম্যবাদে। শূন্যতা। আর মাঝে মাঝে এইরকম দু-একটা উত্তেজক সিকোয়েন্স, এখন যেমন, গোপালবাবুর ঘরে মিহিরের প্রবেশ।

ছমছমে শৈশবের অন্ধকার। ক্রমে আলোকঅভীক্ষা আসে। প্রাকৃতজনের জন্য পুষ্পের উষ্ণতা। রক্তিমতা যদিও অনুপস্থিত ছিল। মিহির স্পষ্টতায় আসছে।

আদতে কি কোনো লেখার কোনো মানে থাকে, কোনো তাৎপর্য? কিছু অবয়ব থাকে একটা লেখার ভিতর : একটা আপাত অর্থময়তা জন্মায়। পাঠক, ব্যক্তি পাঠককে একটা অর্থের সন্ধানে ঠেলে দেয়, অর্থসন্ধানে বাধ্য করে। তাই, তখন, অর্থ উৎপাদিত, অর্থ শেষ অব্দি শুধু সন্ধানের : ব্যক্তি পাঠক ব্যক্তি সমগ্রে ব্যক্তি ইতিহাসে অর্থ খুঁজে পায়।

এই সিকোয়েন্সটা কি কাহিনীর সেইরকম একটা অংশ? ভেবে নিতে ক্ষতি কী? পাঠক অর্থ খুঁজে পায়, লেখক নিজেও, অর্থ আবিষ্কৃত হয়, বারবার, আলাদা আলাদা পাঠককে, এমন লেখা সব লেখকই লিখতে চায়। ত্রিদিবও।

ওই দাঁড়িয়ে-থাকা, মুহ্যমান মিহির, আলো ফুটে উঠছে, অন্ধকার, অস্পষ্ট, বন্ধ ঘরের ভিতর ধুলোয় কুয়াসায় রৈ রৈ নস্টালজিয়া — এগুলোর প্রত্যেকটার প্রতিমা-তাৎপর্য আছে বলে বিশ্বাস করতে সাধ যায় ত্রিদিবের।

আলো ফুটে ওঠা, চোখের আলো-গ্রহণ ক্ষমতা আসছে। আবিষ্কার, কিছু একটা আবিষ্কার, এ সময় কিছু একটা আবিষ্কার থাকেই, প্রভাতে বা জন্মগ্রহণে বা লোডশেডিং-এর পরে আলো যখন লাগে দৃপ্ত, আবিষ্কারটা ঠিক কী হবে? পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় ত্রিদিব নিশ্চিত ছিলনা। এখন স্থির করে ফেলেছে : বই। বই, গ্রন্থ, পুস্তক।

বই, হ্যাঁ, বই-ই মিহিরের আবিষ্কার।

বই একটা রহস্য। একটা চাবিকাঠি। গোলকধাঁধায় ঢোকার সঙ্কেত।

কাগজ, কালি, হয়ত কিছুটা কাপড় বা চামড়া, আঠা, সুতো। এই সবই ক্ষয়ের পদ্ধতিতে, বিকারের পদ্ধতিতে একসময় ধরিত্রীর মোট অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন এবং আরো কিছু মৌলের ভাণ্ডার। মৌলগুলির একটি বিশেষ, নির্দিষ্ট সমাহার : বই।

সব বই, প্রতিটা বই-ই বোরহেসের বালিগ্রন্থের মত। ভিতরের লেখা অক্ষর শব্দ চিহ্নগুলো একই, গোলকধাঁধায় প্রবেশকারী থেকে প্রবেশকারীতে বদলে যাচ্ছে তাদের বাহিত তাৎপর্য। প্রতিটা মানুষের কাছেই বহনটা ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জগত।

অক্ষরগুলো প্রত্যেকটা আলাদা জগতকেই বহন করছে। মোট ব্রহ্মাণ্ড। একই বই, অক্ষরের একই সমাহার, একই মানুষের কাছে আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা তাৎপর্য। প্রতিটা সমাহারই সমস্ত সমাহার।

একটা বই নাও, যে কোনো বই, অক্ষরের একটি নির্দিষ্ট সমাহার, তর্জনী নাও (তর্জনী আজো আছে তোমার : কারো চোখের সামনে কোনোদিন তুমি তুলতে পেরেছ?), রাখো অক্ষরের উপর, পাঠ করো, বার বার, প্রতিটা পাঠ ভিন্ন, প্রতিবারই তুমি আলাদা নারীতে অনুপ্রবেশ করলে, সময়ের নদী বয়ে যাচ্ছিল, পাঠ করতে থাকো : পেয়েছ? পেয়েছ? পেলে কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড? প্রতিটি শব্দকে আমূল পাঠ করতে করতে জানতে জানতে তুমি পৌঁছলে কি বিদ্যায়, সমস্ত বিদ্যায়?

পাওনি। তুমি পাঠ করতে শিখলে না। হায় নিরক্ষর, তোমার কী হবে? দেশের?

এসো পড়াই, কিছু করে দেখাই।

একটা বই, প্রতিটা বই-ই ব্রহ্মাণ্ড। এবং রহস্য : দেখে কিছুতেই ব্রহ্মাণ্ড বলে মনে হয় না।

বই, এত বই কোথা থেকে এল এই বিস্ময়, একত্রে এতগুলো বই বইমেলা বা বই-এর দোকান বা এলাকার টাউন-লাইব্রেরি উদ্বোধনেই দেখেছে কেবল, অথৈ শ্রদ্ধা, মিহির কি একটু থতমত খায়? (বইমেলা, কাহিনীতে উপস্থাপিত মিহিরের যে পরিপ্রেক্ষিত, মিহির কি দেখে থাকতে পারে?)

'গোপালবাবু কি বই চুরি করে?' — এই ধরনের একটা ভাবনা সেই মুহূর্তে মিহিরের চিন্তার শরীরে গুঁজে দেওয়া, কাহিনীতে। একটু হিউমার, একটু উৎকেন্দ্রিকতা : কাহিনীর একটা শরীরী মূর্ততা।

তার পর, ধীরে, মিহির তার স্মৃতিতে ফিরছে। কাহিনী মানে মিহিরের চৈতন্যস্রোত অনুসরণ করে চলা। মিহিরকে মনে পড়ানো হয় একটা হালকা সবুজ মলাটের ইংরিজি বই, অফিসফেরত গোপালবাবু বারান্দায় রাখে, ঘরে না-গিয়ে সরাসরি বাথরুমে, মানে তিন দিক বেড়া দিয়ে ঘেরা, জোড়া-ইঁট পাতা শুধুমাত্র পুরুষদের দাঁড়ানোর জায়গায়, গিয়েছিল। গোপালবাবুর বইটা নাড়ছিল : মা এসে মমতার চুল, চুল না বিনুনি, লাল হলুদ সিল্কের ফিতে, নাইলন বোধহয় তখনো পাওয়া যেত-না, ধরে মুন্ডু ঝাঁকিয়ে দেবে। খুব রেগে নয়।

একবার পোস্টম্যান একটা বইয়ের প্যাকেট দিয়ে গেল। ক্লাস সিক্স বা সেভেন-এর মিহিরের মর্মান্তিক বিস্ময়, পোস্টম্যান চিঠি দেয়, তার কাছে বই এল কোথা থেকে?

একসময় গোপালবাবুর মত গোপালবাবুর বইও একটা অভ্যস্ততা। মিহিরের, বাড়ির লোকের।

এখন, ক্রমউজ্জ্বলায়মান ঘর, বই সংক্রান্ত টুকরো টুকরো স্মৃতির সঙ্গে মিহির এই স্তূপ স্তূপ বইকে মেলাতে পেরেছিল। আবার বিস্ময়ও। সেই দুদিন-চারদিনের একটা আধটা বই থেকে এই জলহস্তীর অবয়ব, বুদ্ধি দিয়ে বোঝা অসম্ভব নয়, মিহির বিস্ময়টাও এড়াতে পারেনি। বছরগুলো প্রবহমানতা, বয়ে যায়, তাদের একত্র সমাহৃত স্থাণু মূর্তিময় দেখেছিল মিহির সম্মুখবর্তী বইয়ের স্তূপে।

বইয়ের এই মোট স্তূপ : বিশালতা, ভয়, শ্রদ্ধা। মিহির গোপালবাবুর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়। শ্রদ্ধার মানুষ মানে ক্ষমতার মানুষ। বড় হয়ে ওঠার, বেড়ে ওঠার পদ্ধতিতে সবাই, মিহির এবং অন্যান্য সবাই, ক্ষমতার কাছে, আরো কাছে গিয়ে দাঁড়াতে শেখে। দাঁড়াতে চায়। সশ্রদ্ধ মিহিরের গোপালবাবুকে একটু আপন লাগে। প্রণাম প্রণতের শরীরকে প্রণম্যের আরো কাছে আনে। তখন, এখন মিহিরের নিজেকে দুশ্চিন্তিত লাগে।

লোকটার কী হল?

এতদিনকার প্রাত্যহিকতার ভিতর আমূল অজানা এই ঘর, ঘরের গর্ভ : জঠর, চারপাশে ইতিহাস, যাকে খুঁড়ে তুলতে হয়। সুড়ঙ্গের ভিতরে তুমি একা, খুঁড়ছ, সন্ধান, ধ্বংসস্তূপ, মানুষ এখানে ছিল, নির্মাণ, ঘাম পেশি রক্ত ও মল, শত সহস্র অজানা বৎসর, মিহির শিহরিত হচ্ছে।

এই শিহরণ আর রোমাঞ্চের থেকে, কাহিনীতে এমনটা ঘটে থাকে, ফিরে আসে মিহির। আসতে হয়। হয়ত কিছু একটা ঘটল। (এখানে একটা কোনো খুঁটিনাটিগত রূপারোপ।) বৌ-এর একটা উচ্চকিত কণ্ঠস্বর কি মিহিরের কানে এল? চেঁচাল? এত চেঁচায় কেন বৌ, বৌ-এরা? শব্দগুলোকে মিহির সঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, অনেকটাই ভঙ্গী থেকে চিনল, পুত্রকে বৌ তিরষ্কার করছে। হয়ত ছেলেটা খাবারের সামনে বসে আছে। আঙুল দিয়ে বারবার উল্টে পাল্টে দেখছে ভাতের ভিতরকার একটা বেমানান ধানের দানা। 'দেখেছ, বসে আছে, আবার, তোমার খাওয়া আমি দেখাচ্ছি, বদমায়েস ছেলে' — গোছের কিছু একটা।

আসল কথা : ফেরত আসা। বৌ-ছেলে থেকে পরিবার থেকে গৃহ, গৃহকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা, গোপালবাবু, সমস্যা নিরসন কল্পে তার সন্ধান, এককথায় পুরো পরিপ্রেক্ষিতটা : যেখান থেকে মিহির শুরু করেছিল, এখন ফিরে আসবে।

গোপালবাবু কোথায় গেলেন, কিছু কি হল তার? উৎকণ্ঠা থেকে ক্রিয়া। ক্রিয়া মানে দৃষ্টিপাত, পরিপ্রেক্ষিতে। বিছানা, বিছানার পাশে তাক, জায়গা বলতে তো এই দুটো, ঘরে আর তেমন জায়গা কই যেখানে প্রয়োজনীয় কিছু থাকতে পারে, ভাবে মিহির, পর্যবেক্ষণ করে, তেমন কিছু পায় কিনা এই সন্ধান।

এক ঝলক, মিহিরের মাথায় ভাবনাটা আসবে, সে খুঁজছে কেন গোপালবাবুর ঘর? কিছু একটা হদিশ? কোনো ঠিকানা? গোপালবাবুর না-ফেরায় উদ্বিগ্নতা, লোকটার খারাপ কিছু ঘটল কিনা, একই বাড়িতে বসবাসকারীর ভূমিকায় থেকে এই কাজ তার করা দরকার, ঔচিত্যবোধ? শুধু এটুকুই? (এই খোঁচটার উল্লেখ বোধহয় এই পরিকল্পনাতে আগেও একবার এল, তাই না? যাকগে, এখন তেত্রিশ কোটি বারও থাকুক, কাহিনীতে শেষ অব্দি একবারই থাকবে, পুনরুক্তি কাহিনীকে ঝুলিয়ে দেয়।) শুধু এইটুকুই? নাকি পুরোটাই একটা ঘটনা-পরম্পরা যাকে পরিপ্রেক্ষিৎ হিসাবে ব্যবহার করে মিহির একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব চরিতার্থতায় পৌঁছে যেতে চাইছে? একটা কৌতূহলের নিরসন? ব্যক্তি গোপালবাবু, তার জীবনের কোনো গোপনীয় গল্প, কেচ্ছা, যেরকম কিছু একটা গোপালবাবু বহন করছে এই আভাস মিহিরের মনে তো আছেই, সেই ব্যক্তিগততম অভ্যন্তরটাকে জেনে ফেলতে চাইছে গোপালবাবুর অগোচরেই? গোপালবাবুর কোনো অজানা হদিশের প্রাপ্তব্যতাটা কি নিতান্তই একটা ছুতো? যদি সত্যিই তাই হয়, মিহির সেটা এমনকি নিজের কাছেও গোপন করতে চায় কেন? কেন এই লুকোচুরি?

অথবা, সে আদৌ গোপন করেনি। তার উদ্দেশ্য সেটাই যা তার বৌ বলছে, সে ভাবছে, পৃথিবী জানছে। দৃশ্যমানতাই বাস্তবতা।

আধো-অন্ধকার, বা আধো-আলো। চোখ ততক্ষণে সয়ে এসেছে। র‍্যাকটা, খাটের পাশেই, তার উপর সারি সারি ছোট বড় শিশি বোতল, দেখতে পায় মিহির। দেখে, প্রতিবর্তী প্রক্রিয়াতেই হয়ত, হাত বাড়ায়, ছোঁয় মিহির। হাতের বাড়ানো আঙুলের ডগায় ধুলোর শুকনো অনুভূতি। কৌতূহল : কী কী ওষুধ খেত গোপালবাবু, মিহিরের ভিতর কি কিলবিল করেছিল? ওষুধ। ওষুধ থেকে এতবছরব্যাপী অসুখের ঠিকানা। অসুখকে, সমস্ত অসুখকে, জানা মানেই অসুখ যার সেই মানুষটাকেও জেনে ফেলা। সে কি জানতে চাইছিল গোপালবাবুকে তার সমস্ত অসুখের ইতিহাসে? ইতিহাসে?

আলো, আরো আরো আলোর একটা আকাঙ্খা, এই সময়, কাহিনীর এই অংশে, মিহির এখন কী করবে, কী সে করতে পারে? আলো জ্বালায় মিহির? নাকি অন্য কিছু?

পরিকল্পনাটা লিখে চলছে, গভীর রাত, ছয়ই জুন চুরানববই, এইমাত্র ছয় হল, ক্লান্ত আঙুল থেকে পেন ফাইলের উপর, পিঠ মাথা চেয়ারে হেলানো, নিছক তাকিয়ে ছিল, ত্রিদিব দেখে তার আমদানিকৃত ডিজিটাল হাতঘড়িতে লিকুইড ক্রিস্টাল নিষ্প্রভ কালো অক্ষরে 'এস-ইউ' মুছে গিয়ে ফুটে উঠল 'এম-ও', রবিবার থেকে সোমবার, ফুটপাথ ও স্থানাঙ্ক একই থাকে, দিন বদলে গেল মাঝরাতে। বেশিরভাগ মানুষই ঘুমে। জানতে পারল না, দিন বদলে গেল। ত্রিদিব বসে থাকে। পেন ফাইল টেবিলের সানমাইকা টপ চৌকো কালো ওয়াকম্যানও ঘুমে। সামনেই। ফ্রিজের ঠান্ডা থেকে বাইরে কত অশব্দ শিশিরের মৃত্যুর দাগ শরীরে নিয়ে তিনশো পঁচাত্তর এমএল রেডজারের বোতলও শূন্য : ক্লান্তি।

আলো জ্বালানোর প্রসঙ্গ : ঝামেলা : যেতে ইচ্ছে করেনা ত্রিদিবের। মিহির শুয়োরের বাচ্চা জ্বালিয়েই খালাস। এখন ভাবতে থাকো, কী আলো, টিউব না বাল্ব, কোনটা সঙ্গত, মানানসই। ওয়ারিং, সুইচ, সুইচবোর্ড — এগুলোর কী হাল। আলোটা কোন দেওয়ালে। ধুলো : আছে না নেই, থাকলে তার চিত্রকল্প, কিছু ধুলো তো থাকবেই। সুইচ খোঁজা ও টেপার সময়ে মিহিরের প্রতিক্রিয়া। এরকম অজস্র কিছু। তার পর সেই উপাদানগুলোকে শুধু আরো আরো বয়ে নিয়ে চলা। আলো নয় এল, তারপর? ওই স্তূপ স্তূপ বই আর মিহিরের শরীর আর অন্য সব কিছুর উপর পরিবর্তিত আলোক-সংস্থানে আলো অন্ধকারের প্রক্ষেপ কী হল?

তার চেয়ে কি আলো-আকাঙ্খায় জানলাই ভালো? জানলা খুলে দিল, ব্যাস, খতম। ম্যাক্সিমাম বাইরেটা একবার তাকিয়ে নেবে : সেই আগেই উল্লিখিত অপরাধবোধ।

'জানলা খোলা' এই শব্দ-দুটোকে মনের গভীরে উচ্চারণ, ঘুম ঘুম নির্জন একটা প্রকৃতির ছবি কাগজের তলে দেখতে পায় ত্রিদিব। ছোটবেলায় হত যেমন, 'হ'-এ 'আ'-কার 'হ্রস্ব-ই'-কার 'স' লেখার পরই দুই-অক্ষরসম্পন্ন সেই ছবিতে একটা প্রফুল্ল হাস্যময়তা, শব্দ নয়, একটা চিত্র যেন, তাতে শুধু জীবন্ত হাসির উপস্থিতি।

একটা ফিল্ম করতে সাধ যায় ত্রিদিবের, একদিন না একদিন করে ফেলবে, উত্তর কলকাতা, হয়ত শোভাবাজার, কোনো গুমোট ভ্যাপসা নিচু অন্ধকার ঘর। একজন কিশোরী। প্রায় মেঝে থেকেই, সরু শিকের গরাদ দেওয়া, লম্বা জানলা। জানলাটা খুলে দিল, নিজের ইচ্ছেয়, হঠাৎ, অকারণে, কিছু না কিছু স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই থাকে। রোজই খোলে যেমন। আজো খুলল। ভাঙা নর্দমা, তেলেভাজার দোকান, পাঁচিলের ওপাশে ইঁট চাপা দেওয়া টিনের চালের বাথরুম, কুণ্ডলী পাকানো ঘেয়ো কুকুর, একজন ঘামশরীর মুটে মাথায় দড়িবাঁধা ঝুড়িতে মোট নিয়ে গেল, রোজকার এই অভ্যস্ত দৃশ্য আজ একটা দুরন্ত তুষারঝড়ে ঢেকে যাচ্ছে, সাদা, সাদা হয়ে যাচ্ছে, বরফ, ধোঁয়া-ধোঁয়া।

জানলা, জানলাই একমাত্র সমাধান। প্রথম খসড়ায় ছিল না। এই দ্বিতীয়টায় এবার এসে যাচ্ছে, একটা আয়নার প্রসঙ্গ, আয়না : একটা সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড। সীমাবদ্ধতার শরীরে কিছু দ্বিমাত্রিক চিহ্ন : ব্রহ্মাণ্ড। ত্রিমাত্রিক, আদত বাস্তবতা বলেই মনে হয়, আয়নার দিকে তাকাও, মৃদু হেসে বলো : ভুল। (বলতে পারো কি আজো, নিজের মুখের উপর, বীরের, বীর হতে চেয়েছিলে, এখন তো তোমার সবই হল, সংসার ধর্মের ষাঁড় বিদেশভ্রমণ?)

দেখো, তাকাও, আয়না তাই যা আয়না নয়। আয়না মানে আয়না ছাড়া আর সব কিছু। আয়নায় তাই থাকবে যা আয়নায় ছিল না।

তুমি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলে, কতটা জওয়ানি, অবার্ধক্য, তোমার ওয়েজ-লেবার-সক্রিয়তা, অরিটায়ার্ড তুমি ছুটছ রিটায়ারমুখী তোমার আয়নার দিকে, আয়নার তুমি তোমার দিকে ছুটে আসছে দ্বিগুণ গতিতে, ছুট, তিনটে রাস্তার সঙ্গমস্থলের দিকে, ইয়োকাস্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সোনার কাঁটা ইয়োকাস্তের পোষাক থেকে তোমার চোখে। কিথাইরোন। তুমি হাঁটছ, লাঠি ঠুকে ঠুকে, অন্ধতা, অন্ধকার, অনির্দেশ্যতার দিকে, অন্ধকার, তোমার শরীর তখন তোমার মা-র শরীর থেকে পৃথক থাকেনা আর। অনির্দেশ্যতা। কোনো শরীরই কোনো শরীর থেকে পৃথক নয় আর, শরীরই নেই কোনো। মৃত্যু। ক্রমে মৃত্যু, ক্রমে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে হাঁটতে মৃত্যুর দিকে চলেছ তুমি। জন্ম থেকে মৃত্যু, তুমি বৃত্ত আঁকছ, শূন্যগর্ভ, শ্রম-সক্রিয়তা তোমার শূন্যতা। তুমি কিছুই আঁকোনি।

আয়না আসলে একটা না, একাধিক ছিল। টর্চার চেম্বার। ইনকুইজিশন?

আয়নার পর আয়নার পর আয়না। তোমার ভগিনী, বোন, তোমার উৎসের শরীর থেকে উৎসৃত আর একটা শরীর, নিহত ছিল। নিধনের আগে ধর্ষণে। তুমি ঢুকছ। ড্রাগনের খোলা মুখ অগ্নি-উৎসারণে। তোমার চারপাশে আয়না।

ঘাতক : তোমার সামনে পিছনে চারদিকে। ঘাতক ও ঘাত এক হয়ে যায়, প্রতিবিম্ব, বল্লম ও বাঘনখ, তুমি নড়ছ, অজস্র তুমি, প্রতিশোধ, শিকার নড়ছে, অজস্র শিকার, আক্রমণকারী ও আক্রান্ত তখন আনন্ত অনন্ত-সংখ্যক প্রতিবিম্ব, তুমি প্রবেশ করেছ, নিষ্ক্রমণ নেই, এন্টার দি ড্রাগন, একজিট দি ড্রাগন নেই, ব্রুস লি তুমি বিষ পান করে মারা যাবে, অজ্ঞাতে, ধীরে, স্লো পয়জন, জানতে পারোনি।

মিহির জানলার দিকে যায়। আলো যা আছে ছিটকিনি সন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট। কাঠের পাটা-দুটো খুলে দেয়। বাবা বেঁচে থাকতে, কাঠের মিস্ত্রি কাঁঠাল গাছের গোড়ায় বসে র‍্যাঁদা চালায়, কাঁঠাল গাছটা আর নেই, কাঠের চোকলা, প্যাঁচানো, জটিল সুন্দর তরুণ উজ্জ্বল রঙে, জেগে ওঠে, যাদু, কিশোর মিহির দেখে, জানলা বানানো হয়েছিল। জানলা খোলা, পাটায় হাত, দাঁড়াবে মিহির। আলো কি বাড়ল খুব, খুব একটা? বাইরে গাছ, পর পর। বেড়ার কচা, মাদার, ওপাশের জামের এগিয়ে আসা ঝাঁকড়া ডাল, ঘন সবুজ পাতার অরণ্য।

ঘরের অভ্যন্তর। মিহিরের দৃষ্টি ঘুরেছিল, শরীর। দেওয়ালের স্পর্শ পায় পিঠে, মিহির, পিঠ তার আশ্রয় খুঁজে নিল। ঠিক তখনই, মোটামুটি অন্ধকার ঘরের প্রেক্ষিতে একটা আয়তাকৃতি উজ্জ্বলতা : আয়নাটাকে দেখতে পেল মিহির। জানলার বিপরীতে, বারান্দায় যাওয়ার এবং এই ঘরের একমাত্র দরজার পাশে। গোপালবাবুর খাট, তার পাশেই দাঁড়িয়ে গোপালবাবু চুল আঁচড়াচ্ছে, অফিসে বেরোবে, চিরুনিটা পকেটে বা অন্য কোথাও রাখতে রাখতে গোপালবাবু বাঁ-হাতে দরজাটা খুলত, মিহির ভেবে নিতে পারে।

স্পষ্টতর দেখার চেষ্টা, তখন মিহিরের অজানিতে তার শারীরবৃত্তে অধিকতর আলোগ্রহণপ্রয়াসে চোখের মনি-দুটির আলোপ্রবেশের ছিদ্র অপ্টিমাম উন্মুক্ত হল, আয়নার বিম্বসকল অর্থপরিগ্রহ করে। ক্রমে। করতে থাকে। একে একে আবিষ্কারে আসে জ্যামিতির নব নব ছক।

ওই তো জানলাটুকু, খুঁজে পায় মিহির, আয়তাকৃতি আয়নায় আয়নার ফ্রেম, তার ভিতরে ক্ষুদ্রতর একটা আয়তক্ষেত্র, জানলার পুরোটা আসেনি, আয়ত একটা খণ্ড, সবই আয়ত কারণ আনুভূমিক-উল্লম্ব এই ছকের সাপেক্ষেই সব কিছু সাজানো থাকে, সমস্ত বস্তু, এমনকি মিহিরের চোখদ্বয় অর্থাৎ দৃষ্টিও। মিহির নড়েছিল, পুরোটাকে সমগ্রকে পাওয়ার চেষ্টা, এখন সারা জানলাই থাকে আয়নায় : মিহিরের দৃষ্টিতে : মিহির আয়নাকে যে-চোখে দেখছে। ওই, ওই তো, ওই যে আমের যে বেঁকা ডালটা ডানদিকে বাইরে বাতাসে, আরে সেইটাই, সেই একই বাঁক, একদম এক, যদিও একটু অস্পষ্ট, আয়নাতেও। মিহির কি এখন কথা বলে? কার সঙ্গে, মমতা, নিজের শৈশব?

ক্রমে বইয়ের স্তূপ, বাইরের রাস্তা, অন্য গাছ, দেওয়াল, অন্ধকার, অনন্ধকার, দেওয়ালের ড্যাম্প যারা ছবি বানাচ্ছে ছেদহীন, আবিষ্কার ক্রমে আরো আবিষ্কার, মিহির নিয়োগ পেয়েছিল, আয়না নিয়ে মিহির ব্যস্ত থাকে, সবই কি সে দেখেছিল স্পষ্ট যৌক্তিক বিজ্ঞাননির্ভর, আঙ্কিক র‍্যাশনাল?

ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু তুমি র‍্যাশনালিটির বাইরে জেনেছিলে বৈজ্ঞানিক, যুক্তির বাইরে? আর কতটুকু উপকথা? উপকথা বাড়ে নড়ে, ঘুমন্ত নারীশরীর, ঘুম না মৃত্যু? তোমার ইড়া ও পিঙ্গলা, সুষুম্নার মূলাধারে সাপ নড়েছিল, সাপ মানে যৌনাঙ্গ, আদিম মানুষের স্টাইলাইজেশন, বইয়ে লেখা আছে, ঘুমন্ত সাপ মূলাধারে, তুমি আগুনের ঝাপট মারো, জাগছে, জাগছে, সাপ প্রব্রজ্যায় আসে, কোথায় তার চূড়ান্ত গন্তব্য? তোমার মস্তিষ্ক?

ত্রিদিবের বেশ ইচ্ছে ছিল, মিহির জানলা খুলছে, তার পরই ধুলো-রঙের ঘরের বাতাসে একটা ব্যাপক নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতার ঠিক কিরকম আকার, কাহিনীতে, তার খুঁটিনাটি পরিকল্পনায় উল্লেখ করে রাখার ইচ্ছে ছিল তার। সবই গুলিয়ে গেল তার। সব গুলিয়ে গেল। ধুলো, ধূসরতা, তারপর আয়না, 'প্রব্রজ্যা', শব্দটা, নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গভঙ্গ, মাথার উপর আঘাত, ভাঙে, গড়ে, ভাঙে, প্রব্রজ্যা, প্রব্রজ্যা, প্রব্রজ্যা, প্রব্রজ্যা, নিরন্তর একটা তরঙ্গভঙ্গ। পথ, ধুলো, পথ, স্পেস : ভূমি যা আয়তাকৃতি নয়, ভূমি, আনন্ত, অনন্তাবধি অনিয়ন্ত্রিত ভূমি, ডাকছে, ডাকছে, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে, নিশির ডাক, নিরন্তর তোমায় ডাকে কেন? কেন ধূসর সর্বদাই এই নিঃসঙ্গতায় নিয়ে যায়? কেন এরকম মনে হয়? মেরুমজ্জায় আর মস্তিষ্কের কোষের গভীরে কোথাও মানুষ একটা প্রব্রজ্যাকে নিরন্তরই বহন করে চলে? ধুলোর অন্তহীন কোমলতা সেই প্রব্রজ্যাকে জাগিয়ে তোলে? আর আয়না শুধু গতিকেই দ্বিগুণ করেনা, ভূমি থেকে ভূমি, আরো আরো ভূমি, যে কোনো আয়নাই ব্রহ্মাণ্ড। বোরহেস লিখেছিল আয়না আর সঙ্গম দুই-ই মানুষের সংখ্যাকে

নিয়ত পরিবর্দ্ধমান করে। বোরহেস শুধু সংখ্যাকে বুঝেছিল, স্থবির অনড় সংখ্যা, গণনীয়। বোরহেস গতিকে বোঝেনি, অগণনীয় সংখ্যাতীত সংখ্যা-উত্তর গতিকে। আয়নার সসীম পরিসরে অসীমের নিয়ত প্রসারশীল গতিকে।

সবই গুলিয়ে গেল, যেমন যায়, তবু জেগে থাকে আরো অন্ধকার ঘর, খোলা জানলা, সদাজাগ্রত আয়না আর নিঃসঙ্গতা। ত্রিদিব না ঠিক করল, কদিন আগেই, শুধুই তো নিঃসঙ্গতা লিখছে, আর কত? এক বৃদ্ধা, তাকে ভালোই লাগে ত্রিদিবের, সেদিন বললেন, পড়তে ইচ্ছে করে, পড়ে ভালো লাগে এমন গল্প উপন্যাস লেখো না কেন, মানুষ জানতে বুঝতে শেখে, সমাজবোধ? কী উত্তর দেবে ত্রিদিব? সে পারে না। যা পারে তাই সে লেখে। চর্তুপার্শ্ব, আক্রমণ, শুধু একটু শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাওয়া, তার অনুভূতি তারই, বেঁচে থাকতে চাওয়া, ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে, আকাশ রাজনীতি যৌনতা গুলিয়ে এলোমেলো হয়ে গেল, ত্রিদিব তখন কী করে? লিখতে তার কুৎসিত লাগে, ঘন্টার পর ঘন্টা, কাগজ ফাইল পেন চেয়ার কোটিতম-বার-শোনা-ক্যাসেট, ঘন্টার পর ঘন্টা, না-লিখে সে পারে না, একমাত্র যে লেখা সে লিখতে শিখেছে, বেঁচে থাকতে চাওয়া, যন্ত্রণার উৎসারণ অপনোদন বিকিরণ।

যখনই একা, পথ, ধুলো, বেরোও ত্রিদিব, ধুলো, পথ, প্রব্রজ্যা : সেই নিরবচ্ছিন্ন ক্রমাগত চাপ, তোমার চোখ অন্ধ, লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটো হাঁটো হাঁটতেই থাকো, কোথায়, কোথাও না, হাঁটতেই থাকো। চাপের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ত্রিদিব, লেখে, এই লেখাটা, অন্য লেখা।

।। পাঁচ ।।

গোপালবাবুর ডায়রিটা এই কাহিনীর একটা মূলবিন্দু, এই পরিকল্পনায় সেটা একাধিকবার উল্লিখিত। প্রথম খসড়ায় ছিল ডায়রি মাত্র একটা। মোটা, বিরাট ডায়রি। প্রায় টেলিফোন ডাইরেক্টরি। বিরাটত্ব মিহিরকে বিস্মিত করেছে, ডায়রির কাগজটা সাংঘাতিক ভালো, লাল কাপড়ে বাঁধাই, ইত্যাদি বহু কিছুই, প্রথম খসড়ার, এই দ্বিতীয় খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। একটা অসঙ্গতি। গোপালবাবুর ডায়রির তাৎপর্য অনেক, সেই প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রচুর, ডায়রিতেই আসার দিবাকর সেন নামে বৈজ্ঞানিক-নায়ককে নিয়ে গোপালবাবুর উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা, এবং গোপালবাবুর মনোজগতের আরো বহু খুঁটিনাটি। এইসব উপাদান পরপর, সুসংহত, সারিবদ্ধ নয়। বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ছেটানো গোপালবাবুর অঙ্কিত অক্ষর সমগ্রে। উপাদানের এই বিপুল পরিমাণ একটি মাত্র ডায়রির পক্ষে বাড়াবাড়ি। আরো, এখনো আপনারা সেই প্রসঙ্গে আসেন নি, ক্রমে আসছেন, ডায়রি, ডায়রি ওল্টানো, ডায়রির সঙ্গে থাকা, নিজের নয়, গোপালবাবুর, কী ভাবে মিহিরের জীবনকে ঠেলছে তার আবাল্য অভ্যস্ত খাতের বাইরে, মার্জিনে, মিহিরের জীবনকে কেন্দ্রচ্যুত করে দিচ্ছে : একটা ডায়রির পক্ষে এতটা তোলঘোল বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হয়।

তাই ডায়রি সমূহ।

ডায়রি না খাতা?

যদি ডায়রি হয়, যেটা স্বাভাবিক নয়, ব্যাংক ইত্যাদি অফিসই ডায়রি-ক্যালেন্ডারের খনি, তাহলে বছর প্রতি একটা না দুটো না আরো বেশি? সব ডায়রিগুলো কি একই রকম? নাকি এক একটা ডায়রি আলাদা আলাদা আকার আয়তন অবয়বের? আর, খাতা হলে? সব একই রকম ছোট সাইজের বাঁধানো খাতা, বছরের পর বছর জমতে জমতে পাঁজা, বাইরে যেমন ভিতরেও তেমনি সাধাসিধে নৈর্ব্যক্তিক, সেটাই কি বেশি মানানসই নয়? ডায়রি তো সামাজিকভাবেই নির্দিষ্ট আত্মলিখনের জন্য, মডেল। গোপালবাবু, তার নামের মত, যদি একটু আনপ্রেডিক্টেবল হতে চান, খেয়ালি?

কাহিনীটা লেখার সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটা এইবার : গোপালবাবুর লেখা। গোপালবাবুর লেখারও লেখক ত্রিদিব, কাহিনীর মতই। তাও দুটো লেখা আলাদা। আলাদা করে চিহ্নিত। চিহ্নটা ঠিক কী হবে? খুব প্রত্যক্ষ কোনো প্রকৌশল, ধরা যাক সাধুভাষা : গোপালবাবু সাধুভাষায় লিখেছেন? এটা ভালো লাগে না ত্রিদিবের। চিহ্নের জন্য চিহ্ন, স্বতোৎসারিত নয়। গোপালবাবুর ভাষা কি তার ব্যক্তিত্বের নির্ভর? গোপালবাবুর ব্যক্তিত্বটা ঠিক কী রকম? ত্রিদিবের থেকে ভিন্ন? গোপালবাবুর জীবন, বাস্তবতা, মনোভঙ্গী সবই ত্রিদিবের নির্মিত, ত্রিদিব লেখে, আগেই ভেবেছে, ভাবনা যা ত্রিদিবেরই অভিজ্ঞতা, তাহলে?

আলাদা তবু হতেই হয়, ত্রিদিব বাধ্য, পাঠকের, আপনার চাহিদা মোতাবেক। দু-একটা উদাহরণ, প্রতিনিধিস্থানীয়, লিপিবদ্ধ থাকছে এই পরিকল্পনাতেই। পরে সেই অনুযায়ী আরো, আরো রচনাংশ, লিখে নেওয়া যাবে, থাকবে ডায়রিতে, মিহির পাঠ করছে আর পাঠের অভিঘাতে প্রভাবিত হচ্ছে, মূল কাহিনীতে।

ডায়রিগুলো, মানে ওই খাতা, ওগুলোর প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি?

কয়েকটা রয়েছে প্রথম খসড়াতেই, ত্রিদিব পড়ে, খারাপ নয়, থাকতেই পারে। যেমন ডায়রির প্রথম পাতায় লেখা 'হিজিবিজি খাতা'। এই প্রসঙ্গে প্রথম খসড়া থেকে একটা মজার বাক্য সরাসরি উদ্ধৃত করা যাক, আন্তঃখসড়া ভাষা-প্রভেদ সত্ত্বেও, "ডায়রিকে খাতা বলার ভিতর একটা সংস্কৃত বাঙালিয়ানা থাকে, আর সেই খাতার নাম 'হিজিবিজি' হওয়াটা সুকুমার রায়ের সঙ্গে একটা অন্বয় সৃষ্টি করে। গোপালবাবুর রবীন্দ্র-অণ্বিষ্ট হওয়াটা বিশেষ কিছু হত-না, বরঞ্চ না-হওয়াটাই বিশেষ, কিন্তু সুকুমার রায়ের সঙ্গে এই অন্বয়টা গোপালবাবুর সংবেদনশীলতার সম্পর্কে একটা মন্তব্য করবে, তির্যক ভাবে।" ভাষার পার্থক্যটা ভারি স্পষ্ট আগের খসড়া থেকে এই খসড়ায়। প্রসঙ্গটা এই খসড়ায় এলে হয়ত এই রকম দাঁড়াত, "ডায়রিকে খাতা বলায় একটা সংস্কৃত বাঙালিয়ানা, আরো খাতার নাম 'হিজিবিজি' : সুকুমার রায়, সুকুমার কেন, বৈকুণ্ঠের আর এক ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের জায়গায়, গোপালবাবুর হৃদয়ে? তার সংবেদনশীলতার বিষয়ে কোনো তির্যক মন্তব্য?" ভাষা যাই হোক বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হয় ত্রিদিবের।

এখন, এই খসড়া অনুযায়ী ডায়রি আর একটা নয়, এক পাঁজা। একটা সম্ভাব্য খুচরো ডিটেইল : মিহির কোনো কোনো খাতার প্রথম পাতায় লেখা দেখছে 'এইচবিকে নাইন', 'এইচবিকে টু' ইত্যাদি। প্রথমে জটিল লেগেছে, পরে বুঝল 'এইচবিকে' মানে 'হিজিবিজি খাতা'। কখনো নিশ্চয়ই খাতাগুলোকে পরপর নম্বর দিয়েছিল গোপালবাবু, সব খাতায় সেটা খুঁজে পায়নি মিহির।

কোনো কোনো খাতায় একটা তারিখ লেখা, প্রথম পাতায়। কোনোটায় একটা তারিখ লিখে একটা তীরচিহ্ন এঁকে আর একটা তারিখ। ডায়রিটা শুরু আর শেষের তারিখ, বোঝে মিহির, একই কালি একই রকম হাতের লেখায় লেখা, অর্থাৎ, শেষ করার পর লিপিবদ্ধ, শুরুর দিন কে বুঝবে কতটা সময় ধরা থাকতে যাচ্ছে এই ডায়রিতে?

লেখাগুলো সবই শুরু ডানদিকের পাতায়, কোথাও কোথাও আকস্মিক একটু ফাঁকা জায়গা।

লেখার বিষয়গুলো নিয়ে ত্রিদিব একটা জটিল ধন্দে : কী লিখতে পারে গোপালবাবু, কী শেষ অব্দি লিখেছিল? লেখাগুলো কি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হবে কাহিনীতে, না, কিছু কিছু অংশ? উদ্ধৃত অংশ কি পরিকল্পনাতেই নির্মিত থাকবে, আগাপাশতলা, নাকি, আপাতত পুজোর চালকলার মত ছুঁইয়ে, পরে গুছিয়ে নামানো যাবে?

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক গোপালবাবু, ছোটবেলায় স্বভাব ভালো ছিল (রেফারেন্স : বিদ্যাসাগর), সুতরাং, নিরক্ষর নয়, বাংলা জানে, ইংরিজিও জানে, নইলে চাকরি পাবে কী করে, তার যা বই খুশি, বিষয়, সেটাই সে পড়তে, লিখতে পারে। সমস্যাটা অন্য জায়গায় : তার কিরকম পড়াশুনো, কোনো কোনো বিষয়ে, কিরকম লেখালেখি সঙ্গত, উচিত, স্বাভাবিক বলে আপনি পাঠক মনে করছেন?

আপনার সাথে ডজে খেলছে, বদমায়সিও বলা যায়, ত্রিদিব পরিকল্পনার শরীরে গোপালবাবু সম্মন্ধীয় অজস্র রহস্যের এলোমেলো উপাদান রেখে এল, কোনো কিছুই বেমানান না-হয়।

তবু। আপাতত কিছুটা পদার্থবিদ্যা, কিছু সাহিত্য শিল্প দর্শন, কিছু ব্যক্তিগত ঘটমানতা, এদের দু-একটা করে ত্রিদিব এখনি তৈরি রাখছে, সঙ্গে পাঠের সময়কার মিহিরের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, পরে জাস্ট এদেরই মত আরো দু-চারটে করে বানিয়ে তোলা, মিহিরের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কাহিনীকে বাড়িয়ে তোলা : ডায়রি-বাস্তবতার অভিঘাতে মিহির ক্রমশ উদ্ভট, এতদিনকার অভ্যস্ত জীবন থেকে দূরে, আরো দূরে, উজ্জয়িনীপুরে, সেটাই কাহিনী।

টেনশন কম নয়, সেই প্রথম খসড়া লেখার সময় থেকেই, নানা নোট রাখছে, পয়েন্টস, ডায়রিতে, খাতায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাও বলে এল, কী কী বিষয় আসতে পারে। প্রথম খসড়ায় হাত দেওয়ার-ও আগে স্পষ্ট না-বুঝেই পড়ে-চলা-কালীন স্টিফেন হকিং-এর ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমে প্রতিকৃত চিন্তাও এতে চলে আসতে থাকবে। তার পর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এক বন্ধু অন্য বই-ও রেফার করে, ত্রিদিব পড়ার চেষ্টা করেছে, ডেভিস, নার্লিকার, এডিংটন; তাদের চিহ্ন ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গেছে পরিকল্পনায়।

দর্শন শিল্প সাহিত্যও তাই।

কোনটা আজকাল মিহিরের জীবন? গোপালবাবুর ঘরে গোপালবাবুর ডায়রি না তার ঘর ঘরণী পুত্র পুত্রাদি তৈজসপৈতৃক-দোকান? কোথায় থাকে মিহির, তার মন, তার দৃষ্টি? অনন্ত অব্দি যা প্রসারিত হয়ে পড়ে আজকাল, প্রায়ই, ঘর রান্নাঘর আমগাছ ভাঙা নর্দমা ইঁটবাঁধানো রাস্তা ছাড়িয়ে। আকাশে, মহাশূন্যে, ব্রহ্মাণ্ডে। ডায়রির প্রসঙ্গগুলো মিহির কি সব বোঝে? বুঝবে কী করে? তবু পড়ে চলেছে ...

> (ক) " 'মৃত্তিকার মত তুমি আজ : তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।'
>
> কানে শুনে এই কোলনকে আমরা পাই-না। শম্ভু মিত্র তার আবৃত্তিতে রোমান্টিক কোমলতায় লাইনটি উচ্চারণ করেছেন। একমাত্র ওই ভঙ্গীতে উচ্চারণ করলেই কোলনটিকে পাওয়া যেতে পারে।
>
> লাইনদুটিতে 'তার' এই শব্দটির অর্থ কবিতায় উল্লিখিত যুবকের নয়। মৃত্তিকার অর্থাৎ ধরিত্রীর প্রেম-এর কথা এখানে বলা হচ্ছে। ঘাস একটি উপমান। মাটির প্রেম থেকেই (যেন) ঘাস জন্মায়। "

শম্ভু মিত্র, নামই একটা কেবল, মিহিরের কি পরিচিত লাগার কথা? কতটা পরিচিত? সেটা কি নাটকের প্রসঙ্গে? আবৃত্তি ব্যাপারটাকে কতটা ধরে উঠতে পারে মিহির? আদৌ?

এই অংশ, কবিতা শব্দটা, পুরো প্রসঙ্গ, মিহির কি তার বাল্যের স্মৃতিতে? স্কুলেই কবিতা পড়া শেষ হয় মিহিরদের, আজকাল আবার ছেলের পড়াশুনো, মিহিরের মাথায় এখানে একবার মমতার ছায়াপাত : 'নদী' কবিতাটার পাশে সাদা জায়গায় মমতা একটা বিরাট আরশোলা এঁকেছিল, নীল কালিতে, মনে পড়বে?

মিহির বিস্মিত হচ্ছে, গোপালবাবু কবিতা লেখে, দেখে তো মনে হয় না, কী সব ব্যাকরণ লিখেছে না, ফিরে এলে ছেলেটাকে পড়াতে বললেই হয়। (ছেলে একটা না একাধিক : ধন্দ : পুনরুক্তি)

> (খ) " ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তার সূত্র আবিষ্কার করেন। (উনি আঠার বছর বয়সে ডক্টরেট হয়েছিলেন। হিটলার জার্মানির একচ্ছত্র অধীশ্বর হওয়ার পরও রয়ে গেছিলেন জার্মানিতে।) এই সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই একটি ভৌতকণিকার অবস্থানগত অনিশ্চয়তা এবং গতিবল সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার গুণফলের আঙ্কিক মান প্লাঙ্ক ধ্রুবকের অন্যূন হয়। অর্থাৎ, একটি কণিকার গতিবল (মোমেন্টাম) এবং অবস্থান একই সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।
>
> এরই সঙ্গে রয়েছে সুপার-পজিশন (অতি-অবস্থান) সূত্র। একটি কণিকা, ধরা যাক ইলেকট্রন, তার দুটি অবস্থা থাকতে পারে এক এবং দুই। কোনটিতে সে আছে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তথাপি একটা না একটায় থাকার তার মোট সম্ভাবনার আঙ্কিক মান এক। অর্থাৎ, কণিকার অস্তিত্ব নিশ্চিত। অস্তিত্বের মূল ভিত্তি অটুট রয়েছে।
>
> ডিরাক তার থিয়োরি অফ ইলেকট্রন উদ্ভাবন করলেন। যে তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্যতা বলে কিছু নেই। শূন্যতা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা যে কোনো কণিকা এবং তার প্রতি-কণিকাটিকে একত্রে উৎপন্ন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ইলেকট্রন এবং পজিট্রন। অর্থাৎ, শূন্যতা থেকে ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করা যায়, উপযুক্ত শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা। শূন্যতা ডিরাকের তত্ত্ব অনুযায়ী একান্তই অবাস্তবায়িত (নন-অ্যাকচুয়ালাইজড) ব্রহ্মাণ্ড। আর, প্রতিটি কণিকা অন্য প্রতিটি কণিকার অস্তিত্বের দ্বারা অতিনির্ণীত (ওভার-ডিটারমিন্ড)। "

মিহির পড়ছে, বুঝতে পারেনি, তার অর্থহীন লাগছিল, তাও পড়ে কেন মিহির? কাহিনীতে কোন শর্ত তাকে পড়তে বাধ্য করে?

আগের বাক্যটা শেষ, পরের বাক্য মাথায় নেই, ত্রিদিব চুপ করে বসে ছিল। হাত, আঙুল বাড়াল, ওয়াকম্যানটা অফ করে, কিংস্টন ট্রায়োর টুয়েন্টি গোল্ডেন হিটস চুপ করে যায়, উই হ্যাড জয় উই হ্যাড ফান নিস্তব্ধতায়, আর একটু চললেই জানতে পারতাম দি স্টার উই কুড রিচ ওয়্যার জাস্ট স্টারফিশ অন দি বিচ। কী, কী সেই কারণ যা মিহিরকে সময়ের বালি খোঁড়ায়, অন্ধকারে, আধো-অন্ধকারে? রহস্য? কী রহস্য? রহস্যকে জানার আকাঙ্খা কোথা থেকে আসে?

তখনই কি সম্মুখবর্তী ক্যাসেটের পাঁজার বাইরে চোখ, টেবিলে ছড়ানো ছেটানো ক্যাসেট, আনজাম, বাজিগর, ডর, নাইন্টিন ফর্টি টু এ লাভ স্টোরি, তাদের উজ্জ্বল প্রচ্ছদ। মাধুরী, শাহরুখ, সানি দেওল, ওই মেয়েটা তনুজার মেয়ে —

নাম ভুলে গেছি, অনিল কাপুর এবং প্রায় প্রত্যেকটা প্রচ্ছদেই কিছু না কিছু পাহাড়, সন্ন্যাস প্রব্রজ্যা অপরিবর্তনীয় গভীরতার প্রেক্ষাপট। হিমালয়।

প্রাকৃতিক গভীরতার, গাছ ও পাথরের পশ্চাৎপটে, বোম্বের ভিড় গাড়ি নগর থেকে দূরে শাহরুখ তার সারোগেট মা-কে খুঁজে পাবে, 'আনজাম'-এ। মা, যে তাকে অশক্ত ভাষাহীন শরীরী-নিয়ন্ত্রণহীন শিশুর অসহায়তা থেকে পরিচর্যায়, যত্নে বার করে আনে, মা-রও তখন মনে পড়ে, প্রেমে স্থানান্তরিত অপত্যে, 'বরসোঁ কে বাদ আয়ি মুঝকো ইয়াদ এক বাত : তেরা বিন নেহি গুজরে দিন, তেরা বিন নেহি গুজরে রাত।' সত্যিই, জন্ম ও শৈশবের পরে শাহরুখের অনেক বর্ষ চলে গেছে। সারোগেট মা মাধুরীকেও মা হয়ে উঠতে হয়েছে এক যন্ত্রণার পর যন্ত্রণার তরঙ্গে আবিল (গর্ভধারণ) পদ্ধতির ভিতর দিয়ে। তার শরীর পোষাক ও সময়ে রক্ত, রক্তময়তাই জন্ম। তখন মাতৃ-আবাহনের মন্ত্র পড়া হচ্ছিল, 'সংহারিণী জগদম্বিকা, নারী বনে যব চণ্ডিকা।' মাধুরীর শরীরের যৌবন, সেই জওয়ানিও জওয়ানি হয়ে ওঠে, যৌনতার উৎসবে, যখন তার চর্তুপার্শ্ব ও সংসর্গ থাকে 'চানে কি খেত' : ফসল, মৃত্তিকা, কৃষি। সারোগেট মা মাধুরী সত্যিকারের মা হয়ে ওঠে, মন্দিরের পাশে অপেক্ষারত, 'নারী সে যো টকরায়েগা, ও খাক মে মিল যায়েগা' : মা-কে ভয় পাওয়ার উচ্চারণ, শাহরুখকে এখনই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে, অন্যায়কারীকে সত্যকার শাস্তির সচেতনতায়, মূল্যবোধে, সঙ্গে নিজেও মরে গেল মাধুরী, সন্তানের মৃত্যুর পরও সে বাঁচে কী করে? শাহরুখ প্যাম্পার্ড, স্পয়েল্ড, প্রোডিগাল, সত্যিকারের মূল্যবোধ ও শাসনে উজ্জ্বল মা খুঁজত, তার জৈবিক মা অযোগ্য, তাই সে মাধুরীকে খোঁজা শুরু করে বাচ্চার মত মাটিতে শুয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে, খুঁজে পায়না সে হাসবে না কাঁদবে, 'কোই বতলাও না ... ম্যায় রোঁ ইয়া হাঁসু', বাচ্চার ঠিক যা হয় মা-কে হারিয়ে।

প্রতিটি জনপ্রিয় হিন্দি ছবিতেই এই মা-খোঁজা, বাবা-খোঁজা, জৈবিক সম্পর্ক হারিয়ে সারোগেট মা বাবা ভাই বোন এবং ছেলেতে পৌঁছনো। সম্পর্ক যা আহরিত। প্রদত্ত সম্পর্কগুলো যা কল্পনায় ও জীবনে উজ্জ্বল সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি তাদের পরিত্যাগ করে আহরিত সম্পর্ক।

জনপ্রিয়তার এই প্যারাডাইমের, গঠনের বাইরে যায় কী করে ত্রিদিব? মিহির বাবা খুঁজছে। (উনিশশো সাতচল্লিশে কেইনস ব্রিটেনকে জানিয়েছিলেন, 'উই আর এ পুয়োর নেশন'। ত্রিদিবের মত মিহিরও কি নিজের কানে কানে বলে, 'উই আর এ বাস্টার্ড নেশন, এসো বাবা খুঁজি'?)

শ্রদ্ধা, না-বোঝার রৈ রৈ কুয়াসা প্রয়োজন পড়েছিল গোপালবাবুর বাবা-উপম হয়ে ওঠায়। মিহির কী খুঁজছে? কোন রহস্য? নিজের বাবার অজানা কন্দর, নিজের জন্মবৃত্তান্ত, মিহির যা জানেনা, কেউই জানেনি? মিহির তাই পড়ে চলে, রহস্য খোঁজা : আত্ম-অনুসন্ধিৎসা।

মিহির পড়েই চলে।

> (গ) ডায়রির একটা পাতা। উপরে তারিখ। লেখা দু-লাইন। তার আগে ও পরে বেশ কয়েক লাইন করে লিখে কেটে দেওয়া। সেই দু লাইন:
>
> " আজ অফিস থেকে ফিরে পুষ্পদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ও জানে-না বাবা-জ্যাঠাদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। "

এটুকু পড়ে, যেমন পরিকল্পনা, মিহির অনেক কিছু ভাবে। লাইনগুলো কেটে দেওয়া : কেন, কোনো অপ্রিয় প্রসঙ্গ? কতটা অপ্রিয়, নিজের ডায়রিতেও কেটে দিতে হয়, যদিও লিপিবদ্ধ রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল। গোপালবাবুর জীবনে পুষ্প নামধারিণী কতটা গুরুত্বপূর্ণ? সম্পর্কটা অবশ্য জ্যাঠা ইত্যাদি। কেমন জ্যাঠা, বাবার বন্ধু থেকে জ্যাঠা? বাবার কতটা বন্ধু, মায়ের?

মিহিরের চিন্তাকে আরো ঘুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে পুষ্পসংক্রান্ত আর একটা উল্লেখে। ডায়রির মূল লেখাটাকে একটা উপরশা বর্গীকরণের ভিতরে আনলে নাম দেওয়া যায়, 'নারী পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে দু-চারটে কথা'। সেই দু-চারটে কথার ভিতরেই নিম্নোক্ত বাক্যটা :

> " যেমন পুষ্প। ও যথেষ্ট আধুনিক অথচ মেয়েদের সাথে মিশতেই পারে-না। "

কী কেলো ভাবুন। পুষ্প যদি মেয়ে তো মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার প্রসঙ্গ আসে কেন? নাকি পুষ্প প্রকৃত প্রস্তাবে মেয়েই, শুধু অলেখক গোপালবাবু লিখতে গিয়ে গুলিয়েছেন, 'তাই' লিখতে গিয়ে লিখেছেন 'অথচ'। ধ্যানধারণায় আধুনিক একটি মেয়ের অত্যন্ত গড় মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সমস্যা হতেই পারে।

অথবা 'পুষ্প' নামটাই কি গোলমাল পাকাচ্ছে? নামটা আসলে পুষ্পনাথ, পুষ্পময়, কিম্বা পুষ্পধেণুই বা কী এমন অসম্ভব? একটি ছেলের ডাকনামও পুষ্প হতে পারে, কোনো পারিবারিক খেয়াল?

ডায়রির পরবর্তী কোনো উল্লেখে হয়ত এর সমাধান আছে, মিহির খোঁজে, পড়েই চলে।

> (ঘ) " লেখা একটা মায়া। মায়ালোক সৃষ্টি করে। একে ইন্দ্রজালও বলা যায়। অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব এই উভয়ই লেখার জগতে তাদের অভ্যস্ত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।
>
> লেখাকে অতিগৌরবদানের, গ্লোরিফাই করার, কোনও অর্থ হয় না। লেখাকে একরকম যুদ্ধ বলে ভাবা যেতে পারে। যে যোদ্ধার কোনও জয়ও নেই, পরাজয়ও নেই। কলম হাতে মৃত্যুই তার একমাত্র কাম্য পরিণতি।
>
> লেখাকে বাংলা ইংরিজি ফরাসি বলে আলাদা করার কোনো অর্থ হয় না। লেখা মানেই একটা নামহীন ভাষা। লেখক সেই ভাষায় লেখেন। যে কোনও ভাষাই সেই ভাষা। সেই ভাষাই সব ভাষা।
>
> কোজাগরী পূর্ণচন্দ্রের রাতে সেই আশ্চর্য শ্বেত নারী আবির্ভূত হন। লেখক লেখেন তার বর এবং অভয় নিয়ে। লেখকের কলম থেকে শ্লোক বেরোয়।
>
> 'তারপর চলে যাব/ সবকিছু ছেড়ে ছেড়ে/ পায় হেঁটে চলে যাব/ পরলোকে স্বশরীরে'
>
> জয় গোস্বামী এক আশ্চর্য কবি। ছেলেটির বয়স কত? আমার ছেলের বয়সী, নাকি আরও কম? ওকে একদিন চর্মচক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে। "

ডায়রির এই অংশ সংক্রান্ত ত্রিদিবভাষ্যে এটুকু প্রকাশ থাকুক যে যেদিন পড়েছিল, তার কয়েকদিনের ভিতরই অফিসে খবরের কাগজে একটি বইয়ের আলোচনাসূত্রে একটি সশ্মশ্রু রুগ্ন মুখের নিচে জয় গোস্বামী এই নাম দেখতে পাবে মিহির, রোমাঞ্চিত হবে। গোপালবাবুর ঘরের কথা মনে পড়ল তার, ডায়রি, শরীর জুড়ে একটা আবেগ সৃষ্টি হয়, তাড়াতাড়ি সেদিন বাড়ি ফিরে আসে মিহির, যেমন আজকাল প্রায়ই ঘটে।

> (ঙ) এই পাতার উপরে, নিচে ডানপাশে অনেক হিজিবিজি। দু-একটা বেশ আলপনাউপম। 'বাঃ, আর্টটা বেশ ভালো তো', এই বাক্যাংশটাই আসে মিহিরের মাথায়। সেই পাতাতেই, ছোট ছোট হিজিবিজিগুলোকে পাশে রেখে, বেশ কয়েক লাইন লেখা, হাতের লেখাটা এদিন একটু বিশ্রী।
>
> " মানুষ কেন এত খারাপ ব্যবহার করে? এই অফিসেই এতগুলো বছর ধরে রয়েছি আমি — ঈশ্বর জানেন, কারোর সাথে কখনও কোনও নীচতা করিনি। আমি কি মানুষ হিসাবে একটু বেমানান? "
>
> এটুকু পড়ে মিহিরের একটু দুঃখিত লাগে। লোকটা বেশ ভালোমানুষ ছিল। এতগুলো বছর, খাওয়া নিয়ে, থাকা নিয়ে, ভাড়া নিয়ে কখনো কোনো ঝামেলা নেই। বুড়ো মানুষটা গেল কোথায় : মিহির বিষাদিত হয়।
>
> নতুন প্যারাগ্রাফে একবার 'দিবা' লিখে কাটা, তারপর লেখা :
>
> " দিবাকর সেন সম্পর্কে আর একটা জিনিষ ভাবলাম — লোকটা বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। একটা গবেষণা ইন্সটিটিউট বা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একা থাকে নিজের কোয়ার্টারে। খাবার খায় সেখানের ডাইনিং হলে। নিজের কাজটুকু নিজেই করে নেয়। "

মিহিরকে দিয়ে এবার যেসব ভাবানোর কথা, সেগুলো কি মিহিরের পক্ষে ভাবা সম্ভব আদৌ? কে জানে?

হিজিবিজি, হাতের লেখা খারাপ : গোপালবাবু মানসিক ভাবে অস্থির। একটু অন্যমনস্ক। স্বাভাবিক। অফিসে কি ঘটেছে কিছু একটা? হয়ত কোনো সহকর্মী। হয়ত উচ্চপদস্থ কোনো অফিসার। বা, ব্যাংকে যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তাদের কেউ একটা। মোট কথা, গোপালবাবুর মন খারাপ।

তারপর, গোপালবাবুর মন-খারাপের সঙ্গে দিবাকর সেনকে যুক্ত করে আরো কিছু ভাবে মিহির, সেসব এখন আর লেখার মানে হয়না। দিবাকর সেন বিষয়টা মূল কাহিনীতে আর আসছে না। কেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। (ঙ)-শীর্ষক

ডায়রি-অংশটা প্রথম খসড়া থেকে টুকে দিয়েছে ত্রিদিব। দিবাকর সেনের উল্লেখটাও ঘটে গেল। মূল কাহিনীতে ঘটবে না, যদি না পরিকল্পনার একটা তৃতীয় খসড়া লেখা হয়, এবং তাতে বিষয়টা ফের বদলায়।

শুধু উপরের পাঁচটা নয়। কাহিনীতে আসার ডায়রির আরো অনেক অংশ। আসছে আরো পদার্থবিদ্যা। জিটিআর অর্থাৎ, আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব, ভূমি-কাল পশ্চাৎপট আর নিষ্ক্রিয় পশ্চাৎপট নয়, তাদের বদল ঘটছে : মেট্রিক টেন্সর, তাদের বদলের গতিবিজ্ঞান, অর্থাৎ ভূমি-কাল এই আঙ্কিকতা আর অনড় ছক নয়, প্রাক-জিটিআর পদার্থবিদ্যায় যা ছিল। আসছে তাপগতিতত্ত্বের সময়ের গতিমুখ। এন্ট্রপি, শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বাড়ছে, এটা একটা স্থির অবিচলিত একমুখী গতি নয় আর। তাপগতিতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলির গতিমুখের, সময়ের, বিপরীতায়ন সম্ভব। একটা স্টোকাস্টিক, র‍্যান্ডম ঘটনা, যার একটা নির্দিষ্ট আঙ্কিক সম্ভাবনা আছে। আসছে সুপারসিমেট্রি, অতিসৌষাম্য। রৈখিক এবং কৌণিক গতিবলের, শক্তির সংরক্ষণ সূত্র, অর্থাৎ ভূমি-কাল সৌষাম্য, অন্যদিকে ব্যারিয়ন রাশি, ইলেকট্রন রাশি, স্ট্রেঞ্জনেস, চার্ম ইত্যাদির সংরক্ষণ সূত্র অর্থাৎ পদার্থের আভ্যন্তরীন সৌষাম্য : এই উভয়-সৌষাম্যকে মিলিয়ে একটি অতিসৌষাম্য, হয়ত যার মাত্রার সংখ্যা এগার, ভূমি-কালের চার ছাড়া আরো সাতটি।

আসছে সাহিত্যে যুক্তির ভূমিকা। যুক্তি এবং ক্ষমতা একই গঠন। কমলকুমারও যুক্তির দাস। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী, 'হৃদি ভেসে যায় যমুনার জলে ... ', গভীর সাহিত্যসৃষ্টি। জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, জীবনানন্দ দাস। ইংরেজ ক্ষমতা, দাস, নতুন বাংলা গদ্য, যুক্তির দাস, ব্রাহ্ম সংস্কৃতি। আসছে বাক্যগঠনে নানা ধরণের অপোজিশনের তত্ত্ব : মূর্ত-বিমূর্ত অপোজিশন, গতির অপোজিশন, ক্রিয়াকাল (টেন্স) এর অপোজিশন, সন্দেহ এবং নিশ্চিন্ততার অপোজিশন, মায়া ও বাস্তবতার অপোজিশন।

এক কথায় সবকিছু।

বা, কোনো কিছু নয়।

দিবাকর সেন নামক বৈজ্ঞানিক-নায়ককে নিয়ে গোপালবাবুর প্রস্তাবিত উপন্যাসটা পরিত্যক্ত হল কেন?

দিবাকর সেন, বৈজ্ঞানিক, কাজের ক্ষেত্র ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি প্রকরণ একদিন জমাট দ্রবীভূত এক হবে, একটা সমগ্রতা, ঈশ্বর, চরাচর যার থেকে প্রবাহিত। চরাচরের প্রতিটি প্রবণতা তখন একটিমাত্র প্রবণতা : ঈশ্বরের। এই ঐশ্বরিক সমগ্রতা খুঁজছে দিবাকর সেন, ভাবে গোপালবাবু, কেন? গোপালবাবুও কি সমগ্রতা খুঁজছে, একটা কেন্দ্র, যাকে ব্যাখ্যা করলেই সবকিছু ব্যাখ্যাত হয়? গোপালবাবু, মিহির, ত্রিদিব, প্রত্যেকে তার নিজের মত করে খুঁজছে একটা একেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড? (ঈশ্বরের নাম যাই হোক, গ্রান্ডফোর্স বা এসেন্স বা লেবার পাওয়ার বা মানবিকতা)

প্রথম খসড়া অনুযায়ী, গোপালবাবুর ডায়রিতেই লিপিবদ্ধ থাকছে এসব খুঁটিনাটি, লড়ছে দিবাকর সেন, বছর যায় বছর মাস দিন ঘন্টা সেকেন্ড, তখনি কি দিবাকর সমুদ্রতটে তারামাছ খুঁজে পেল, তারার আকৃতি (হঠাৎ মনে এল : সিপিএম পাঁচ দাগের তারা আঁকে, এসইউসি সাত দাগের, তিন দাগের তারা আঁকা যায় না; নয় দাগের?) যা তারা বলে মনে হত, দূরগামী তারা, আরো দূরে চলে যায়, রেড শিফ্ট, এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স, দিবাকর কি নিজের গবেষণায় হারিয়ে যাচ্ছে?

তার পরেই সেই সমীকরণ মালিকা। সমীকরণ যারা কিছুই সরল করেনি। ইন্টিগ্রোডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটি গঠন। অসমাধেয়। দিবাকর তাদের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে, ইন্টারপ্রিটেশন, চেষ্টা থেকে আর একটি সমীকরণ মালিকা। সমীকরণের সংখ্যা আগের মালিকার থেকেও বেশি, একইরকম অসমাধেয়।

এই ভাবে বছর থেকে বছর : মালিকা থেকে মালিকা, জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সমীকরণরা অসমাধেয় থাকে।

কত কিছু ভাববে ত্রিদিব, গেডেলের উপপাদ্য, একটা তথ্য সমাহারকে কিছুতেই শুধু তাদের নিজেদের দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না — এইসব কাজে লাগাবে, কাহিনীর বেশ একটা বড় অংশ জুড়ে শুধু অংক, দিবাকর সেন পৌঁছয় অসমাধেয়তা বিষয়ক একটি তত্ত্বে : ব্রহ্মাণ্ডকে বিবৃত করা যায়, বিবৃত করে চলা, বিবৃত করে চলা, বিবরণের বিবৃতি, বিবরণের বিবরণের বিবৃতি, ব্যাখ্যা করা যায়না, ব্যাখ্যার চেষ্টা মানেই অব্যাখ্যনীয়তা গড়ে তোলা।

দিবাকর সেনের উপন্যাস নিয়ে নতুন আর কী বলার থাকে, গোপালবাবুর ডায়রিতে যা বলে দেওয়া যায়না, তাই কি ত্রিদিব বাদ দিল, নাকি একটা সঙ্কোচ, লজ্জা?

দ্বিতীয় খসড়া লেখা কালীন, প্রথম খসড়া পড়তে পড়তে ত্রিদিব হঠাৎ লক্ষ্য করবে দিবাকর সেন নামটা। বোকা বোকা লাগবে তার নিজের কাছেই, এই পেঁচিয়ে নিজের কথা বলার চেষ্টায়, ত্রিদিব সেনগুপ্ত, দিবাকর সেন, কোনোদিনই কি তার মৌলিক কিছু বলার থাকতে পারে না, একটু মৌলিক কিছু, মার্জিনালি হলেও মৌলিক? এমএসসি পরীক্ষায় যেমন ডিসার্টেশন লিখতে বলা হয়, রিভিউ অফ প্রেজেন্ট লিটারেচার, তারপর সামান্য একটু নিজের কথা, উইথ মার্জিনাল অরিজিনালিটি।

গোপালবাবুর ডায়রিতে পদার্থবিদ্যার যে প্রসঙ্গগুলো, শিল্প সাহিত্য দর্শনের, তাদের মধ্যেই সেই অন্তঃশীলা, ব্রহ্মাণ্ড হারিয়ে যাওয়া, সমগ্রতাকে আর খুঁজে না-পাওয়া, সময়ের নিবিড় একমুখিনতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শূন্যতা মানে আর শূন্যতা নয়, শাসন, ক্ষমতা, ক্ষমতার শেষ সাম্রাজ্য : যুক্তি, ত্রিদিব আর ভাটাতে চায়না এগুলো নিয়ে, পরিকল্পনার তিন এবং কিছুটা চার পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে ইতিমধ্যেই।

মিহির এগুলো বুঝছে কিনা, কতটা বুঝতে পারল, বোঝার পরিমাণ যতটাই থাকুক, তার চিন্তা পদ্ধতি কতটা উদ্দীপিত অর্থাৎ পুরোনো অভ্যস্ত চিন্তাপ্রক্রিয়ার বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে, তার অনুভূতির প্রকরণ কতটা বদলে গেল এটা আদৌ প্রশ্ন নয়।

মূল বিন্দু : অভিঘাত। গোপালবাবুর ডায়রি, আলো-অন্ধকার ঘর, রাশি রাশি ধূলিধূসর বইয়ের পরিপ্রেক্ষিত, একপাঁজা রোজনামচার খাতা, অজানা সব বিষয় ও ঘটনা, মিহির বদলে যাচ্ছে, মিহিরের জীবন, মিহিরের বৌ আজকাল তাকায়, তাকিয়ে দেখে প্রায়ই মিহিরকে, মফস্বলী নিম্নমধ্যবিত্ত দাম্পত্যে এত নাটকীয়তা আসে কোথা থেকে, মানুষটা একই আছে, দৃষ্টিটা এত বদলে গেল কী করে, কবে?

কখনো একটা পাতা খুলে ফুঁ দেয়, আঙুলের লেগে-যাওয়া ধুলো, গোপালবাবুর মোটা সুজনি-চাদর পাতা বিছানায় ঘষে ও, একটু অপরাধবোধ সহ, কখনো আবার খেয়ালই করে না ধুলো লেগেছে কিনা, কখনো বা বিছানার ধারে বসে থাকে, খাতাগুলোর দিকে মাথা অল্প ঝোঁকানো, হাতের নাগালের মধ্যেই খাতাগুলো, বসেই থাকে মিহির, রোজনামচাগুলো ওর জীবনের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকা মানেই কি খাতাগুলোর সঙ্গে : গোপালবাবুর ডায়রি?

একদিন একটা খাতা খুলল মিহির, প্রায়ই খোলে, আনতাবড়ি একটা পাতা। বাঁদিকের পাতাটা সাদা, পুরো। ডানদিকেরটাও অনেকটাই। একটা হালকা বাদামি কালচে-লাল হালকা পোঁচ বাঁদিকের পাতার মাঝামাঝি থেকে ডানদিকে, নীহারিকার লেজের মত তার প্রান্তটা ডানদিকের পাতায়। (রঙটা সম্মন্ধে মিহির কি স্থির হতে পারে, ঘরের আলোর অবস্থা?) পোঁচটা তুলি দিয়ে টানা দাগের মত। ডানদিকের পাতার উপরে ডানদিকে কিছু একটা লেখা, খুদে খুদে প্যাঁচানো অক্ষরে, চোখ কুঁচকিয়ে মিহির পড়ার চেষ্টা করে, নিশ্চিত হতে পারেনা, তারিখ নয় বলেই মনে হয় তার। কোনো শব্দ। ওখানে কিছু একটা লিখলেন, কী, কারোর নাম, তারপর কী হল? গোপালবাবু চুপচাপ বসে আছেন, বা, হয়ত পেন কামড়াচ্ছেন, বা, নাকের নিচে আঙুল ঘষছেন, মিহির ভাবার চেষ্টা করে। সামনেই চায়ের কাপ, মাঝে মাঝেই কাপ তুলে চায়ে চুমুক দেবেন গোপালবাবু। চা-টা কে দিয়ে এল? প্যান্টটা তুলতে তুলতে সদ্য নিদ্রোত্থিত মিহির, অথবা অনেক পরে, 'কাকাবাবু' সম্বোধনকারিনী মিহিরের বৌ? ওই পাতায় তারিখ না-থাকুক, আগে পরে দু-একটা তারিখ দেখে মিহির কি বোঝার চেষ্টা করে? পোঁচটা দেখে মিহিরের মনে হয়েছিল চায়ের দাগ বলে, মাথার অভ্যন্তরে একটা ছবি নির্মাণ করে, গোপালবাবুর ডায়রি চায়ের কাপ পেন, মিহির কল্পনার পদ্ধতিতে, তার এখন একটা নিয়োগ থাকে, এই নিয়োগই মিহির চেয়েছিল বুঝি, চারপাশের বস্তুসংস্থানের বাইরে দূরে, চেয়েছিল বুঝি? মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি, আঁধারঘুঁজির বুকে?

গত পরিচ্ছেদে, আধোঅন্ধকার ঘর, জানলা খোলা, রোমাঞ্চ ও অপরাধবোধের সেই প্রথম সাক্ষাতকে মিহির এখন পেরিয়ে এসেছে। আবাল্যবর্তমান প্রাত্যহিক অজানার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতকে। তালাঝোলানো তাও বন্ধ নয় সেই দরজা ঠেলে মিহির ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ... সাক্ষাতে। ক্রমে রোজই, বারবার, এবেলা ওবেলা এই ঘরে প্রবেশ করছে মিহির। বারবার ফিরে আসে গোপালবাবুর ঘরে। তার খোঁজা শেষ হয়নি, শেষ হয়না, শেষ হয়না কোনো খোঁজাই? আরব্ধ,

আরব্ধের দিকে দৌড়ও, ধাবমান, পৌঁছলে আরব্ধে, কোন আরব্ধে, এখানেই পৌঁছতে চেয়েছিলে তুমি, স্বপ্নে, এই ঘুম চেয়েছিলে বুঝি? যে আরব্ধ নিয়ে এই পরিকল্পনা শুরু হল, যে কাহিনী, সেই কাহিনী কি এখনো একই থাকে, খসড়া থেকে খসড়ায়, এই খসড়ারই ক্রমবর্দ্ধমান শরীরে?

মিহির রোজ একবার, একাধিকবার, বারবার গিয়ে বসে গোপালবাবুর ঘরে, ধুলো পড়া ময়লা বিছানায় ডায়রিদের পাশে। মেঝের উপর ময়লা পুরোনো ভাঁজ ভাঁজ খবরের কাগজের উপর রাখা ছোট বাঁধানো খাতার পাঁজা। খাতাগুলো তোলে, একটা, দুটো, হাত বোলায়, আঙুল, বন্ধ করে, খোলে আবার। পোস্তানির সস্তা কাপড়ের কালো সুতো, এখন ধূসর, বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

মিহির এখন ভয় পায়। ডায়রিদের, খাতাগুলোকে। যদি কোনোদিন এরা বিশ্বাসঘাতকতা করে? খুঁজছে সে, খাতাগুলো, কাগজপত্তর, যদি কোনোদিন কোনো আনতাবড়ি উন্মোচিত হয়ে পড়া কাগজ সত্যিই জানিয়ে দেয় গোপালবাবুর এই আকস্মিক অনুপস্থিতি সংক্রান্ত কোনো দ্বিধাহীন সূত্র : নিঃসংশয়ে জানা যাবে গোপালবাবু বিষয়ে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই : গোপালবাবুর এই ঘরে, এই খাতাদের কাছে ফিরে আসার তার আর কোনো কারণ থাকবে না।

সেই শূন্যতা, মিহির ভয় পায়।

যদি হঠাৎ গোপালবাবু একদিন ফিরে এল, চুকিয়ে দেয় সমস্ত বকেয়া, ফের পুরোনো ধারাবাহিকতা, দিনগুলো ফের আগেকার প্রত্যেকটা দিনের মত, আবার কিছুতেই আগের মত নয়, তখন তারা বহন করছে এই দিনগুলোর স্মৃতি, যখন মিহিরের একটা নিয়োগ আছে, ফিরে এল গোপালবাবু, তখন?

সকালবেলা, ঘুম থেকে উঠে, একসময় না একসময় সবাই ঘুম থেকে ওঠে, মাথা ভার, মেঝেতে পা দিলেই একটা চিনচিনে ব্যথা পা কোমর মেরুদণ্ড বেয়ে মাথা অব্দি : আগে থেকেই জানে মিহির, চোখ ঘোলাটে, অল্প জ্বালাও করে, প্রত্যেক দিনই প্রত্যেকটা দিনকেই আরো কাটিয়ে উঠতে হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা বলে মনে হত, সেই দিনগুলোই হঠাৎ বদলে গেল, এখন আর মিহিরের দিনগুলোকে অর্থহীন লাগেনা। বৌ সকাল ঠিক পৌনে ছটায় ছেলেকে (ধরা যাক বড়ছেলেকে) ঘুম থেকে তুলে দেয়, দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে পড়তে বসবে ঠিক ছটায়, ছেলেকে ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায় মিহিরেরও, আগেকার মত আর বিরক্তি আসেনা মিহিরের। সেই মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায়, অথবা সর্বক্ষণ অনুক্ষণই সে বহন করছিল, মাথার ভিতরে, গোপালবাবুর ঘর, ডায়রি, অস্পষ্ট অন্ধকার। সব সময়ই সে যে যাচ্ছে ঘরটায় তা নয়, ইচ্ছে করলেই সে যেতে পারে, তার যাওয়ার মত একটা জায়গা আছে, নিয়োগ।

ডায়রি, খাতাগুলো তাকে একটা শান্ত পূর্ণতা দিয়েছে। সন্ধানের, তপস্বীর পূর্ণতা। পূর্ণতা : উদ্দেশ্যপূর্ণতা। বাসে কেউ আজকাল তার পা মাড়িয়ে দিল তো মিহিরের মনে হয়, 'যাকগে'। কে আর পেয়েছে তার মত রহস্যের ডায়রিতে পৌঁছনোর সুযোগ?

ডায়রির পৃথিবী, তার পারস্পরিকতা, ছন্দ মেলায় মিহিরের পুরোনো আবহমান পৃথিবী, একই ছন্দে স্পন্দিত হয় এখন। তোমার জীবনের তাৎপর্য কী? তাই-ই যা তুমি অনুভব করেছিলে। মিহিরের অনুভব, এই সব দিন রাত্রিতে, সুপক্ক যবের ঘ্রাণে ভরে আসে, নিজেকে উর্বর লাগে। জীবনের দিকচক্রবাল থেকে দিকচক্রবালে একটা উদ্দেশ্য। সন্ধান। একটা চরিতার্থতা। ডায়রির সাথে যাপিত তার সময়, আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-আবিষ্কারের প্রহর।

নিজের ভিতর পরতের পর পরত চিন্তার, অনুভূতির, বীক্ষার গভীরতা: মিহির অনুভব করে।

গোপালবাবুর ঘরে ডায়রির সামনে সে বসে থাকে। একা। সমাধির শান্তি খুঁজে পায়। চিন্তার অনুভূতির গভীরতম প্রদেশে মগ্ন হওয়ার অতলান্ত শান্তি। নিজেকে দেখে কি মিহির অবাক হয়? নিজেকে চেনার কত বাকি ছিল তার। এতক্ষণ নিজের সঙ্গে একা থাকা, কথোপকথন, চিন্তা, ছড়িয়ে পড়ছে শৃঙ্খল থেকে শৃঙ্খলে, শৃঙ্খলগুলোকে নিজের মাথায় সাজিয়ে নেওয়া : এগুলো এতদিন তার ক্ষমতার মধ্যেই ছিল, মিহির জানতে পারেনি।

প্রত্যেকটি সাধনা, তপস্যা, সন্ধানই এক ধরণের আত্মসুখ, স্বার্থপরতা। ডায়রি-নির্ভর মিহিরের আত্মমগ্নতা : পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিহিরের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। চারপাশের চেনা মানুষেরা মিহিরকে অচেনা হয়ে যেতে দেখে।

শুধুই আকাশ, কসমস নিয়ে ভাবত দিবাকর, তার আলুসেদ্ধ সংক্রান্ত চিন্তাও কি এতে বদলে যাবে না?

মিহিরের বৌ-ও একটু ভিতু-ভিতু হয়ে পড়বে। নিজের এই অস্বস্তি, বৌ নিজেই বুঝে উঠতে পারেনা। আগে, মিহিরের কথায় বিরক্তি তৈরি হলে, দাম্পত্যে এমনটা ঘটেই থাকে, মুখে সবসময় কিছু বলে না, মুখ বেঁকাত, তাচ্ছিল্য। আজকাল পারে না। আরো, সামনে যখন কোনো আয়না থাকে।

মিহির বাড়িতেই থাকছে, ডাকলেই সাড়া পাওয়া যায়। তাও মিহির তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে ওই ঘরে চলে যাওয়া মাত্রই আকাশে বাতাসে একটা অসহায় শূন্যতা।

দিনের অন্য সময়গুলো, মিহির এই ঘরেই থাকে, গোপালবাবুর ওই ঘরে নয়, তখনো কেন মিহিরকে ক্রমে তার অপ্রাপ্তব্য বলে মনে হয়? মিহিরের অফিসের, পাড়ার চেনা-পরিচিতরাও মিহিরকে বদলে যেতে দেখছে, বৌ বুঝতে পারে। মিহির কি ব্যবহার খারাপ করছে? না। তাও কেউ আসেনা কেন? আগে যেমন আসত, সকালে কি বিকেলে, অফিসের দিন কি ছুটির দিন, বৌ-এর সীমিত চায়ের বাজেটে অর্থনৈতিক ধ্বস। আসেনা কেন? আসুক, তাদের সাথে কথাবার্তা, মিহির ব্যস্ত থাকুক।

কাহিনী হল এই অংশটাই। মিহির তার আবাল্যবর্তমান রহস্যের জঠরের ভিতর, ক্রমে, দিবাকর সেনের ব্রহ্মাণ্ড রহস্যে উপগত হওয়াকে প্রত্যক্ষ করছে, এখন এই খসড়ায় দিবাকর সেনই নেই আর, নিজেই ক্রমে অজানা ব্রহ্মাণ্ডে উপগত হচ্ছে। অজানা ব্রহ্মাণ্ড : অজানার ব্রহ্মাণ্ড। প্রত্যক্ষ করার তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, গোপালবাবুর ঘরে সে পৌঁছতে চেয়েছিল, গোপালবাবুর ডায়রি তার জীবনচর্যা হয়ে গেছে।

সবসময়ই কি ডায়রির সঙ্গে থাকছে মিহির? সে নিচু হয়ে, ঝুঁকে বসে থাকে গোপালবাবুর বিছানায়। একটু সঙ্কোচ, অনুপস্থিত মানুষের খাটে বসার। জানলাটা, সেই প্রথম দিন খুলেছিল, এখনো খোলা, রোজই ঘরে ঢুকে খুলে দেয়। এইখানে, এই ভঙ্গীতে বসে, মাঝে মাঝেই, চোখ তখন ডায়রিতে নয়, আয়নাটা দেখে মিহির। সামনের রাস্তার কিছুটা। গাছ, গাছের ডাল, গাছের পাতা, গাছের মধ্যবর্তী আলো অন্ধকার। রাস্তার এপারের গাছ, ওপারের গাছ, একটার উপরে, মধ্যে, নিচে, ভিতরে অন্যটা : মিলে মিশে গেছে। তারই মধ্যে আকস্মিক আচম্বিত উপস্থিতি : আকাশ। আঁকাবাঁকা পাতার রেখা, জানলার ফ্রেমের ঋজুরেখা, আয়নার ফ্রেম, সীমারেখার মধ্যবর্তী অনন্ত আকাশ, সেই আয়নার ভিতরে। আয়নায় উপস্থিত আকাশ, এই আকাশ, কতদূর পর্যন্ত, আয়না থেকে কতদূর, শূন্যে, মহাশূন্যে, কতদূর অব্দি আকাশ? মিহির আজকাল আকাশের কথা ভাবে।

মিহির বদলে যাচ্ছে। পরপর কতগুলো সিনেমা এল, এই যে সামনের টেবিলে ক্যাসেটগুলো পড়ে আছে, মৃত সাউন্ডট্র্যাক, 'বাজিগর', 'ডর', 'আনজাম', 'নাইন্টিন ফর্টিটু এ লাভ স্টোরি', তারও আগে 'হাম হ্যায় রাহি পেয়ার কে', 'আয়না', 'খুদদার', ওর তো এখন মনেই পড়ে না। 'খুদদার' তো বৌ একাই দেখল, পাশের বাড়ির বৌ-এর সাধ, ভালো খাওয়াল, ভিডিও এনেছিল। দেখতে দেখতেই বৌ ভাবে, ও-ও যদি দেখত, ঠিক জানে বৌ, রাতে, সব কাজ সারা হলে, ড্রেসিং টেবিলের পাশে টুলে বসে ও ঠিক একটা সিগারেট ধরাবে (লালের উপর নীল সরু দাগ), ঠিক বলবে, 'করিশমা কী গাইল না : নীলি নীলি আঁখে মেরি, ম্যায় কেয়া করুঁ — তাই তো? গোবিন্দাটাও কম না। ওই গানটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল, জানো তো?' বৌ-ও অনিশ্চিত মাথা নাড়বে, সায়সূচক, তারপরই দুজনেরই হয়ত একসাথে চোখ পড়বে, বাচ্চাটা/ বাচ্চারা ঘুমিয়েছে কিনা। ও কিরকম বদলে যাচ্ছে, ওই ছাই-এর ঘর। বৌ-এর শরীর জুড়ে রাগ হয়।

ওরই বন্ধু, সমর না কী যেন নাম, ইস্কুলে পড়ত একসঙ্গে। মাঝে সাঝে আসে। এক কাপ চা, কখনো একটু রুটি চচ্চড়ি, ঘরে থাকলে, একটু খায়, কথাবার্তা বলে কিছুক্ষণ, চলে যায়। বেশি আসে রোববার। পিয়ারলেসের এজেন্ট। বৌ নিজে তো আর শুনতে যায়নি, ও নিজেই বলেছে, মাঝে সাঝে, সমর ছেলেটা ইস্কুলে পড়াশুনোয় ভালো ছিল। নাটক করত, গান করত। ওই নাটকের দলেরই একটা মেয়েকে বিয়ে করে। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করত, কলকাতা থেকে তাদের অফিস-ই উঠিয়ে দিয়েছে, চাকরিটা চলে গেছে, ওদিকে একটা বাচ্চা, সেটা ভোগে খুব। ঠাকুর করুন, নিজের কারোর না-হয়, সেই লোকটা, সমর, আসে মাঝে সাঝে, দেখলেই কেমন দুঃখী লাগে, কার যে কী কর্মফল।

সমরের জন্যে দরদ আছে ওর, কথা যে তেমন বলে তা নয়, কিন্তু এলে উঠতে দিতে চাইত না, দরদ আছে বলেই তো মনে হত বৌ-এর। সেদিন চা দিয়ে রান্নাঘরে আসতে আসতে শোনে বৌ, শুনেই দাঁড়িয়ে গেল, কথার কী ছিরি, ও

বলছে, 'মরে যাওয়ার কথা ভেবে দেখ, ভাবতে ভালো লাগবে। তুই বললি না, মরে যাচ্ছিস এই করতে করতে, সত্যিই মরে যাওয়ার কথা ভেবে দেখিস, দেখবি মরার মধ্যে শান্তি আছে, আরাম, আকাশে উড়ে যাওয়ার মত।'

বৌ-এর গায়ে কাঁটা দেয়, এখনো, চেনা মানুষটা এমন হয়ে যায় কেন, ঠাকুর, এ কী হল?

মিহির-এর পরিবর্তমানতার কিছু ডিটেইলস, বৌ-এর অনুভূতি, কাহিনী এইটাই। মিহির-এর জীবনে সন্ধানের যে গতি, মিহির তাতে মিশে যায়, যাচ্ছে। রহস্যের শরীরের নজদিকে গিয়ে দাঁড়ানো। রহস্যের সমাধান নয়। রহস্যের অপনোদন চায়না মিহির। রহস্যের বিষয়ে মননের ভিতরে থাকতে পাওয়া : মিহির বেঁচে থাকছে।

বছর, মাস, বছর গেছে। মিহর ভাবত একটা সময়ের কথা, পৌঁছতে চাইত, যখন সময়টার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সে এই কথা ভাবছে তা সে নিজেও জানতে পারেনি। নিজের সঙ্গে নিজের কোনো কথোপকথনই ছিল না মিহিরের, নিজের চিন্তার সঙ্গে। উদ্দেশ্য সন্ধানে পৌঁছনোর চেষ্টাতেও সে পৌঁছতে পারেনি।

এইটাই কাহিনী। গোপালবাবুর ঘর। ডায়রি। আর মিহির। মিহির : তার সমস্ত চেতনা, আবেগ, সততা ডায়রির মুখোমুখি। ঘরের বাতাসে অন্ধকার। আলো। অস্তিত্বের সন্ধ্যাভাষার চর্যাপদের অক্ষরে অক্ষরে, মিহির নড়েছিল, অক্ষরে অক্ষরে। মিহির তার মোক্ষে, চরিতার্থতায়। মোক্ষের সন্ধানই মোক্ষ। ত্রিদিব মোক্ষে। মোক্ষের সন্ধানের আলোচনাই মোক্ষ। সময় বিদ্যাকে হত্যা করছে। বিদ্যার সন্ধানই একমাত্র বিদ্যা। ব্রহ্মাণ্ড দেখার চোখের সামনের আলোয়, অন্ধকারে। মিহির তার অভ্যন্তরকে আলোড়িত হতে দেখে। বারবার। আলোড়নে পৌঁছতে চায় মিহির।

মিহিরের অন্ত্র স্নায়ু হৃদপিণ্ড বেরিয়ে আসে শরীর থেকে। একটা বায়ব তরল ক্বাথ নির্মিত হতে থাকে। নির্গলিতার্থ তরল কঠিন ক্বাথ, জীবন জন্মায়, জীবন মরে গিয়ে মেশে, শরীর থেকে মস্তিষ্ক বাইরে, মস্তিষ্ক থেকে স্মৃতি, তুমি হাতড়াও, ক্বাথের ভিতরে, নড়ছ, এখনো তোমার ঘাড়ের পাশে ফুলকার চিহ্ন, স্মৃতি দেহ থেকে দেহান্তরে, তুমি নড়ছ, পেশী মেদ কৈশিক নালী অতিক্রম করে আলো আসে, আধো-আলো আধো-অন্ধকারে, তোমার শরীর নড়ল, কখনো হাঁটু, মাথা, হাতের মুঠো গোটানো, জননীর গর্ভের আঁধার, মণ্ডের ভিতর তোমার মনন, মিহিরের। মিহিরের আবেগ, আবেগের সততা, জন্মানোর আকাঙ্খা, জরায়ুর পেশি জুড়ে প্রবল কুঞ্চন, তুমি আশ্রয়চ্যুত, বেরিয়ে আসছ, অনন্ত অন্তহীন নিরন্তর প্রব্রজ্যায়, তোমার, মিহিরের শরীর ঘিরে আলো অন্ধকারে জীবন নির্মিত হতে থাকে : মৃত্যু। তুমি নড়েই চলবে, এখন থেকে, অভিশপ্ত তুমি, আশ্রয় থেকে চ্যুত, নড়তেই থাকবে, স্থানান্তর, মৃত্যুর সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে নিরন্তর প্রব্রজ্যায়।

।। ছয় ।।

পরিকল্পনাটা শেষ। তাও, মিহির বা গোপালবাবুর মত (গোপালবাবুরটা স্থিরনিশ্চিত নয়) ত্রিদিবও বেঁচে আছে। বেঁচে তো থাকতেই হয়, মরে যাওয়ার আগে অব্দি।

বেঁচে থাকা মানেই স্থানান্তর। ভূমি ও কালের মাত্রায়।

ত্রিদিবও স্থান পরিবর্তন করে। সেই এলাকায় গেল, যেখানে থাকত একসময়, সল্টলেকে আসার আগে। যেখানে, যে এলাকার অধিবাসী মিহির, ত্রিদিবের (পরি)কল্পনা অনুযায়ী।

ওখানে অনেক পুকুর। সম্বৎসর মৌসুমী বৃষ্টিকলরোলের গন্ধ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে। মাটিতে নাক নিয়ে যাও, বোঁদ আর কম্পোস্টের গন্ধ, পাচ্ছ? স্তর স্তর শ্যাওলা, ল্যাম্পপোস্টের শরীরে নারকেল গাছে প্রাকৃতিকতা। এক ইঞ্চি ফাঁকা জমিও নেই কোথাও, গাছ আগাছা ঘাসের প্রকোপমুক্ত।

ওখানে বাতাসে যৌনতা ঘোরে, মাটির খুব কাছ দিয়ে। বাঙালি যৌনতা। সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্র আর বৈষ্ণব পদাবলী। আকারে এত বড়, কিশোরীদের স্তনেও দুধ আছে বলে মনে হয়। যৌনতা, হরমোন, শরীরী প্রত্যক্ষতার অভাব নেই। খাদ্য? ওখানের পুরুষেরা সবই দ্রাবিড় স্থূলতায়। মেদের, পৃথুলতার আধিক্য, শরীর আরো কম আর্য, অনধিক সাড়ে পাঁচ ফুটের কাঠামো, পুরোনো মোটা গাছের গুড়ির মত কালো চামড়া। তারা মাটির যৌনতার উত্তেজনায় আক্রান্ত।

যৌনতা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। এই দুটোর প্রতি জৈবনিক আগ্রহ তাদের তাড়া করে, নিরন্তর। পরিমাণ যাই হোক, কম বা বেশি। ওখানের বাতাসে যৌনতা এত যে একটি পুরুষ একটি নারীও পরস্পরকে অতিক্রম করে না পরস্পরকে নারী ও পুরুষ বলে না-চিনে।

যৌনতার সেই আদিম আগ্রহের বাতাসেও ত্রিদিবের মৌল বিষণ্ণতা, মৌল একাকীত্ব। নিজেকে অন্যের ভিতর খুঁজে না-পাওয়ার বিষণ্ণতা, একাকীত্ব। বহন করে, রাস্তায় হাঁটে ত্রিদিব। ভিতরের রাস্তা, সরু, কম লোকসঙ্কুল, টিমটিমে রাস্তার আলো, কোথাও পিচ, কোথাও মাটির, একসময় তাকে পৌঁছে দিল বড়রাস্তায়। কত মানুষ, কত মানুষ চারদিকে : এদের প্রত্যেকের প্রতিটি স্নায়ু শিরা একদিন চিরে চিরে জেনে ফেলবে ত্রিদিব। লোক, রিকসা, মোটর, বাস, লরি। রিকসার হর্ন।

একটা দোকানের সামনে ত্রিদিব দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঠের একটা খুপরি, নিচে চাকা লাগানো। দোকানের ভিতর একটি ছেলে। বসে আছে। ওকে চেনে ত্রিদিব : তপু। ওর ভাই মনোজ বিশ্বাস, মফস্বলের ভালো ফুটবল খেলোয়াড়, সবাই চেনে। সিগারেট চায় ত্রিদিব। তপুকে দেখে। শ্লথ ক্লান্ত নির্জীব নড়ে ওর হাত।

তপুও তাকে চেনে। এলাকার লোক। একসময় এলাকার লোক ছিল। এখানে সবাই সবাইকে চেনে।

তপু : ক্লান্ত, শ্লথ, নির্জীব। সিগারেট দেয় তপু। ওর চোখে কি একটা ঘৃণা : সল্টলেকে চলে যাওয়া লোকের প্রতি সল্টলেকে চলে যেতে না-পারা লোকের? তপু সিগারেট দেয়। ত্রিদিবকে দেখে তপু, তপুর অসম্ভব ধীরগতি চোখ ও চোখের পাতা নড়ে। ত্রিদিব পয়সা বার করে, হাসে। হাসিটা দুর্বল ছিল, চোয়াল হনু ভ্রূ পেশি নড়ে ওঠে না। তপু তাকিয়ে থাকে, চোখ নামিয়ে নিল, খুচরো পয়সা ফেরত দেয়।

আবার হাঁটে ত্রিদিব। বড় রাস্তা থেকে ফের ভিতরের রাস্তায়। চারপাশে বাড়ি, অন্ধকার, বাড়ি। বেড়া, পেঁপেগাছ, অন্ধকার। ত্রিদিব হাঁটে। কোথাও কালভার্ট, কোথাও পুকুরের পাশে ক্ষয়ে সরু হয়ে যাওয়া মাটি, সন্তর্পণে পা ফেলে, কোথাও আলকাতরা লাগানো শালকাঠের ফ্রেমে ফাঁকা করে পাতা মুলিবাঁশের জানলা, ভিতরে আলো, কিশোরের এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার। গলিটা আঁকাবাঁকা, ত্রিদিব হাঁটে, মিহিরের বাড়ির দিকে। মিহিরের বাড়ির বাঁশের চটার বেড়ার গায়ে লাগানো কচাগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মিহিরের বাড়িটাকে দেখে ত্রিদিব। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো, মিহিরের বাড়ির পাশের নর্দমায় পাঁকে পিচ্ছিল আর মসৃণ ইঁটের টুকরোর গায়ে প্রতিফলন।

ডিজিটাল হাতঘড়ির সুইচ টিপে আলো জ্বালায় ত্রিদিব। কুড়িটা বাইশ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, মিহিরের বাড়ির পাশে। একটা মাত্র আলো, দেখে ত্রিদিব, ভিতরের ঘরে জ্বলছে। কোনোমতে আলোকিত পার্শ্ববর্তী রান্নাঘর।

উনুনের উপর চড়ানো রান্না, ছ্যাঁৎ শব্দ শুনতে পায় ত্রিদিব। মিহিরের বৌ-কে সে তৈরি করে নিতে পারছে মাথার ভিতরে।

মিহিরের বৌ রান্নার সরঞ্জামের সামনে বসে আছে, রান্না করার উঁচু ছোট পিড়ি। যুবতী শরীর ঘিরে নরম ছাপা শাড়ি, ব্যবহারে ব্যবহারে বাতাস ও জলের কোমলতা, প্রেমিকার শরীর যেমন, নিষ্প্রভ রঙে চতুর্পার্শ্বিক গাছ ও মাটির গন্ধ। ছেলেটা বসে আছে। সামান্য দূরে। ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যবর্তী চৌকাঠ থেকে ফুট-দুয়েক ওপাশে, মেঝেতে। বইখাতা সামনে ছড়ানো, একটা ক্যানভাসের ব্যাগ, একটা পেন্সিলের বাক্স : ভিতরে জমানো পনের পয়সা আর দুটো পেরেক। মিহিরের বৌ রান্নার ব্যস্ততার ভিতরই দেখে, নজর রাখছে ছেলেকে। ঘর থেকে বারান্দায় বেরনোর চৌকাঠের পাশে ক্ষয়াটে, গর্ভবতী মিনি। লেজটা দোলে মাঝে মাঝে, হয়ত হাওয়ায়।

মিহিরের বাড়ির বেড়ার ভিতর একটা আমগাছ, ডাল ছড়িয়ে গেছে নানা দিকে। ত্রিদিবের দিকেও। মাথা কাঁধ থেকে সামান্য উপরে নিঃশব্দে কম্পমান তার পাতাগুলো। গাছের এই নৈকট্য ত্রিদিবের চারপাশের আলো-অন্ধকারকে একটা অবয়ব দিয়েছে : ত্রিদিব দাঁড়িয়েছিল, অবয়বের অভ্যন্তরীন।

মিহির কোথায়? ঘরেই কোথাও, নাকি, গোপালবাবুর ঘরে?

কোণের ঘরটা অন্ধকার।

মিহির কি ঘরেই বসে আছে : বৌ আর ছেলের চোখের সামনে? তার প্রিয় আসন ড্রেসিং টেবিলের টুলে?

দাঁড়িয়ে-থাকা ভাঙে ত্রিদিব। আর একটু এগিয়ে যায়, বাড়ির কোণটা অতিক্রম করে। এখান থেকে চোখে পড়ে বন্ধ দোকানঘরের এগিয়ে আসা টিনের চাল। সবটাই কালো। টিন, গাছ, বাড়ির দেওয়াল। কালোর ভিতরেই ঘনতার তারতম্য, ত্রিদিবের চোখে আকারগুলো স্পষ্ট হয়, একসময় রোজই দেখেছে, কতবার। মিহিরের দোকানটা বন্ধ, এটা নতুন, আগে শুধু খোলাই দেখেছে। গোপালবাবুর ঘরে প্রবেশের আগের ও পরের দিনগুলো পৃথক হবে, ত্রিদিব জানত, এরকমই করতে চেয়েছে, চেয়েছিল, তাও সে আলোড়িত হয়, চিন্তাগ্রস্ত, কেন? মিহির কি রহস্যের বন্ধঘরের দরজা না-খুললেই পারত, প্যান্ডোরার বাক্স? দোকান বাড়ি বৌ ছেলে এসবিএসটিসি আর চার্মিনার স্পেশালের ধারাবাহিকতা, ছেদ না-পড়লেই ভালো হত? ভালো?

মিহিরের বৌ, ও কী ভাবে নিল পুরোটাকে, ত্রিদিব কৌতূহলী হয়। মিহিরের প্রাত্যহিকতা আর নেই, ভেঙে গিয়েছে, গোপালবাবুর ঘর, ডায়রি, অনুপ্রবেশ। মফস্বলী নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে থেকে মফস্বলী নিম্নবিত্ত পরিবারের বৌ, মাধ্যমিকটাও করে উঠতে পারেনি, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কাকে বহন করে এল সারা জীবন, আশৈশব, স্বামীপুত্রকে রেঁধে খেতে দেওয়ার অন্নের অভাব যেন না-হয়, হে ঠাকুর, সেই ভীতিকেই কি আরো বাড়িয়ে তোলে গোপালবাবুর ডায়রি? কাকাবাবুর উপর কি তার রাগ হয়? রাগ কি ভিতরে ভিতরে আজকাল তাকে একটু নীচ আর অশালীন করে তোলে? অথবা, গোপালবাবু, মিহিরের রহস্য, মিহির বদলে যাচ্ছে : এই পুরোটাই তার কাছে বহিরাগত, প্রক্ষিপ্ত : বন্যা, বৃষ্টি, বজ্রপাত? ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া যখন আর কিছু করার নেই, থাকে না, এমনকি দুঃখও পাওয়ার থাকে না?

ত্রিদিবের সাধ যায় মিহিরের ঘরে গিয়ে বসতে। চৌকাঠের ধার ঘেঁষে বসবে, চৌকাঠে নয়, সে জানে অঋণী থাকতে আগ্রহী মিহিরের বৌ সেটা পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে নয় হাত দিল বিড়ালটার গায়ে। রোগা খসখসে-লোম বিড়ালটার সরু সরু পাঁজরের বক্রতার ফুলে ওঠা আর নেমে যাওয়া, ছন্দটা তার আঙুলে পৌঁছচ্ছে। চোখের সামনে মিহিরের ক্লাস ফাইভ-সিক্সের দ্রাবিড় ছেলেটা (অন্য কোনো ছেলে, আরো ছোট, বিছানায় ঘুমচ্ছে?) তেল-চুকচুকে কালো চুলের নিচে কুচকুচে কালো চোখের মণি, ত্রিদিবকে দেখছে, সসঙ্কোচে। মাথা বেঁকাবে-না, মা রয়েছে সামান্য দূরেই, চোখও এই দিকে, জানে সে। মিহিরের বৌ কাজের ব্যস্ততায় পায়ের গোছ অব্দি উঠে আসা শাড়ি নামিয়ে নিয়েছে, গাছকোমর করা আঁচল খুলে কাঁধে জড়ানো, অভ্যাগতের সম্মুখীন সৌজন্য। তার আগে শাড়ির আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুখটা কি একটু মুছে নিল? ত্রিদিবকে জিগেশ করেনি, এক কাপ জল চাপিয়ে দিল উনুনে, ছোট সসপ্যানে, কড়াই নামিয়ে।

ত্রিদিব বসে থাকে। চৌকাঠের পাশে। তার উপস্থিতি মিহিরের বৌ আর ছেলেকে একটু নড়িয়ে দিয়েছে। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে ওদের অস্তিত্বের ছক বিপর্যস্ত করতে সে চায় না। সে দেখতে চায়। মিহিরের অনুপস্থিতিতে, মিহিরের বৌ আর বাচ্চা, পরিবার, ঘর, সে দেখে, দেখতে দেখতে একসময় মিহিরকে গোপালবাবুকে ডায়রির ব্রহ্মাণ্ডকে সে জেনে ফেলবে। সে দেখে, জানুক আর না-জানুক, রহস্যকে খুঁজে চলে।

মিহির ও ঘরে থাকতেই পারে। থাকুক, থাকুক না? ঘরেই কোথাও একটা, এখন হয়ত বিছানায় ঠেস দিয়ে মেঝেতে, ত্রিদিবের এক কাপের সঙ্গে তার জন্যেও এক কাপ চা করে দিতে বলুক বৌকে। ত্রিদিব দেখছে। নরম হলদেটে আলোয় বেশিরভাগটাই ঘন রঙের, নরম বুনোটের বহিঃতল সম্পন্ন বস্তুনিচয়ের পরিপ্রেক্ষিৎ, মিহিররা একটা পরিবার, এক ধরণের সমগ্রতা। ত্রিদিব দেখছে। আরো ভালো করে দেখার জন্য সে কি ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে?

না, বসেনি, বসা যায়না। কাছে গিয়ে বসলেই কথা বলতে হয়। কথা, শব্দ : একটা ছক, আমাদের ছকের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়, শব্দের খাঁচায় বন্দী করে। আর কোনো দেখা থাকে না, বোঝা, জানা, কিছুই না। দেখতে দেয় না কথারা। কথারা শুধু ক্লান্ত করে।

মিহিরের বাড়িতে ঢোকেনি ত্রিদিব। একটা বাড়ির সামনে, বাইরে, অন্ধকারে, রাস্তার উপরে এই ভাবে আর কতক্ষণ : আজ, এগারই সেপ্টেম্বর, উনিশশো চুরানববই, রাত নটা তিরিশে লেখা শেষ করে ত্রিদিব হাঁটতে শুরু করে, ফের।